Vol. 4 | No. 1 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্য

Volume	4
Issue	1
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী আবদুল মান্নান
Published online	June 15, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i1.3
Pages	77-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আ

Check for updates

কাজী আবদুল মান্নান

মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলোর মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছে মহাকবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য। কায়কোবাদের মহাকবি নামে যে খ্যাতি তারও অনেকটা অবলম্বন মহাশ্মশান কাব্য এবং তার বিশাল কলেবর। কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঊনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে সাত সর্গ। ষাট সর্গে প্রায় নয়শ' পৃষ্ঠার এই কাব্য বাঙলা ১৩১১, ইংরেজী ১৯০৪ সালে, প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে কাব্যটির কয়েক বছর সময় লেগেছে। আসলে এর রচনাকাল ঊনিশ শতকের শেষ দিকে। কোহিনুর পত্রিকায় ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০৫ (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) সালে মহাশ্মশান প্রথম খণ্ডের প্রথম সর্গ প্রকাশ পায় এবং উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে কাব্যের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। এ সময়টাকে বাঙলা খণ্ডকবিতার স্বর্ণযুগ বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা সাহিত্য চিত্রা কাব্যের মধ্য দিয়ে গীতিকবিতার এক বিশিষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত করে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নৈবেদ্য কাব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু আখ্যান-কাব্যের যে ধারা রঙ্গলাল প্রবর্তিত করেন তার প্রবাহ মহাশ্মশান কাব্য রচনাকালে একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়েনি। নবীন সেনের বহু আলোচিত 'ত্রয়ী' কাব্যের তৃতীয় খণ্ড 'প্রভাস' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কায়কোবাদের কাব্য যুগধর্মের বিরুদ্ধ-সৃষ্টি হয়ত নয়। তবে বিহারীলাল খণ্ড কবিতার যে ধারা প্রবর্তন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ যার অপরূপ বিস্তার সাধন করেন সে ধারাকে অস্বীকার করতে গিয়েই যেন, মহাশ্মশান কাব্যের পরিধি এত বড় হয়ে উঠেছে। একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধযজ্ঞকে রূপায়িত করতে গিয়ে কবি বিশাল কাহিনী, ভয়াবহ সংঘর্ষ, গগণস্পর্শী দম্ভ এবং মর্মভেদী বেদনাকে নানাভাবে চিত্রিত করেছেন। বিশালতার একটা মহিমা আছে। কায়কোবাদ সে মহিমাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন মহাশ্মশান কাব্যে।

'মহাশ্মশান' পড়তে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে এ কাব্যের মানবীয় আবেদন। পূর্বতন কাব্যগুলোর মত পৌরাণিক কাহিনী, অলৌকিক পরিবেশ বা দেব দেবীর

সমাবেশ মহাশ্মশান কাব্যকে পাঠকের অনাত্মীয় করে তোলেনি। ঐতিহাসিক মানবজীবনের মহিমাকেই কবি অঙ্কিত করতে চেয়েছেন এবং 'মহাশ্মশান' অনেকটা ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের রূপ লাভ করেছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ আব্দালীর নেতৃত্বে ভারতের মুসলিম শক্তির সঙ্গে মহারাষ্ট্র তথা উদীয়মান হিন্দু-শক্তির যে সংঘর্ষ ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধনামে খ্যাত তাই এ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। পাক-ভারতের ইতিহাসে জাতি ও গোত্রের উত্থানপতনে পানিপথের স্মৃতি বিজড়িত। কুরুক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পাক-ভারতের ঐতিহাসিক গতিধারার যে পরিবর্ত্তন তা কবির মনে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। পানিপথের যুদ্ধ তো শুধুমাত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় কত মানব মানবীর জীবনে যে অপরিসীম ব্যর্থতার হাহাকার সৃষ্টি হয় তা চিরকাল ঐতিহাসিকের অগোচরেই থেকে যায়। পুরুষের সংগ্রামের পেছনে নারীর যে অপূর্ব আত্মত্যাগ সে কাহিনী কোনদিনই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়না, থেকে যায় মানব সমাজের অজ্ঞাত। এ বেদনাকে ব্যক্ত করিতে গিয়ে নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত নারী কবিতায় বলেছেন ঃ

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?

কায়কোবাদ তাঁর বিপুল কাব্যের মধ্যে একদিকে যেমন পানিপথ প্রান্তরের ভয়াবহ রূপ অঙ্কিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি পানিপথে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের পরিণতিকেও করুণ এবং মর্মান্তিকরূপে চিত্রিত করেছেন—তা যেমন জাতীয় জীবনে তেমনি ব্যক্তি জীবনেও। মহাশ্মশান কাব্যে কবিপ্রেরণার প্রধানতঃ দুটি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে দু'টি বৃহৎ ঐতিহ্যবান জাতির সংঘাত এবং সেই সংঘাতে সৃষ্ট ব্যক্তির জীবনে বিপুল ব্যর্থতা। হিন্দু ও মুসলমান জাতির বলবীর্য এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা যেমন তাঁর কাব্যের বিরাট অংশ অধিকার করেছে, তেমনি এব্রাহিম-জোহরার দাম্পত্য প্রণয়ে নৈতিক দ্বন্দ্ব, আতা খাঁ-হিরণের একনিষ্ঠ প্রেম, সেলিনার অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং লবঙ্গ-রত্নজীর আদর্শের ঐক্য ও প্রেমের গভীরতাকেও তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সব ঘটনার ঊর্দ্ধে। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যে মহাশ্মশান শুধু ভারতের দুটি জাতির জীবনেই নয়, কতগুলি নরনারীর জীবনেও বটে। পানিপথ প্রান্তর এবং সেই প্রান্তরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-যজ্ঞ কবিকল্পনাকে কিরূপ উজ্জীবিত করেছিল তার পরিচয় মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকাতেই পাওয়া যায়। কবি বলেছেন ঃ

"পানিপথ বড়ই ভীষণ প্রান্তর ; ইহার রেণুতে রেণুতে বিপুল সম্রাজ্যের ধ্বংশাবশেষ ও অস্থিমজ্জা ইহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কত পতিহীন দুঃখিণী রমণীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে ও তপ্ত অশ্রুজলে ইহা রঞ্জিত হইয়াছে, কত পুত্রহীন জনকজননীর ভীষণ আর্তনাদে ইহা প্রতিধ্বনিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে···।" মাইকেল মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের প্রেরণা সম্পর্কে বলেছিলেন : The idea of Ravan elevates and kindles my imagination ; কায়কোবাদও তাঁর মহাশ্মশান সম্পর্কে যেন বলতে চেয়েছেন : The idea of the battle of Panipath elevates and kindles my imagination.

মহাশ্মশান কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন : "কে আমার এই মর্ম্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পরের হিতার্থে আত্মবলিদান করিতে সমর্থ হইবে!" কায়কোবাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল একটি দরদী প্রাণ। দেশ, সমাজ, জাতি তথা মানবতার মঙ্গল ও হিত সাধনই ছিল তার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা। অন্যত্র কবি প্রার্থনা জানিয়েছে : "পারি যেন নাথ সাধিতে-সংসারে জীবের মঙ্গল।"

কবি ছিলেন উদার ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সম্প্রদায় বা ধর্মবিদ্বেষ তার অন্তর এবং কাব্যকে বিষাক্ত করতে পারেনি। সংস্কারমুক্ত মন ও বলিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানবজীবন ও মানব সমাজের মহিমাকে অবলোকন করেছেন। মহাশ্মশান কাব্যের চরিত্রগুলোর মধ্যেও এ উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের আদর্শ বীর 'আমেদ আব্দালী শাহা' যুদ্ধে জয়ী হয়েও আহত বন্দীদের সেবার জন্য উদগ্রীব। তাঁর মতে—

"বিধাতার রাজ্যে
শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে করিব সাহায্য
আর্ত্তজনে, ইহাই যে অঙ্গ ইস্লামের।"

ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত আদর্শ—বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সর্বমানবের কল্যাণ কামনা মহাশ্মশান কাব্যের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে বিকশিত করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে পুরুষ চরিত্র যেমন ধৈর্যে, বীর্যে ও ত্যাগে মহিয়ান, নারী চরিত্রগুলিও তেমনি প্রেমে, বীরত্বে ও সেবায় মহিয়সী। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিম বীরাঙ্গনাগণের ঐতিহাসিক চরিত্রই সম্ভবতঃ কবিকে সেলিনা, জোহরা প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহাশ্মশান কাব্যে মুসলিম জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সমসাময়িক কালের হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে খুব ভিন্ন ধরণের নয়। বর্ত্তমানের

হৃতশক্তি মুসলমানদের জাগানোর জন্য অতীতকালের মুসলমানদের বলবীর্য, ঐশ্বর্য, ধর্মবোধ ও মহত্ব কাব্যের প্রধান বিষয়রূপে অবলম্বন করে, কবি, মুসলমান শাসন-কালীন দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরীর ঐশ্বর্য এবং মুসলমান সম্রাট, সেনাপতি, যোদ্ধা প্রভৃতির বীরত্ব, বর্ণনা করেছেন—তাঁদের জাতির আদর্শ পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। কায়কোবাদ তার কাব্যে হিন্দু কবির মত প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে হীনরূপে অঙ্কিত করেন নি এবং এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও কবিসুলভ ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে মুসলিম পক্ষের জয় হয়েছিল সত্য কিন্তু কবি সে জয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। বৃহত্তর অর্থে, হিন্দু এবং মুসলমান দুই জাতিরই যে সর্বনাশ সংঘটিত হয়েছিল সে বেদনা অনুভব করেই তিনি তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছিলেন। পরস্পরবিরোধী দুটি বৃহৎ শক্তি যুদ্ধের যে প্রলয়শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল তাতে পাক-ভারতের স্বাধীনতা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে সর্বস্বান্ত, অবসন্ন রাজশক্তি ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল। পানিপথ যুদ্ধের এই মর্মান্তিক পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই যুদ্ধান্তের বিজয়োৎসবকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন ঃ

সেই জয় রবে, সেই বিকট হুঙ্কারে
স্বাধীনতা-লক্ষ্মী দেবী আতঙ্কিত প্রাণে
এ জন্মের মত হায় মুদিল নয়ন।"

কায়কোবাদ রূপসন্ধানী কবি। মহাশ্মশান কাব্যে কবিসুলভ সৌন্দর্য্যবোধ পাঠককে চমৎকৃত করে। সুন্দর নগর, প্রাকৃতিক সুষমা ও নরনারীর রূপমাধুর্যকে তিনি নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন রূপবতী ও প্রাণ-ময়ীরূপে। সন্ধ্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

অস্তগত দিনমণি ম্লান কমলিনী
কাঁদিছে নিরখি শূন্য গগণের পানে
কাঁদে যথা শূন্য প্রাণে নব বিরহিনী
যায় যবে প্রাণ কান্ত দূর দেশান্তরে।

বসন্তে ধরণীর পুষ্পসম্ভারের মধ্যে রূপলীলাকে অঙ্কন করেছেন ঃ

মালতী মতিয়া যুঁই অলির সোহাগে
সরমে মরমে মরি আখি নাহি মেলে
সমীরের চুমো খেয়ে নব বধূ প্রায়
মুখখানি ঢাকিতেছে পাতার অঞ্চলে ;

কায়কোবাদ তাঁর কাব্যকে বলেছেন মহাকাব্য, কিন্তু এর প্রেরণা খাঁটি গীতি প্রেরণা। কবি-প্রাণের দুর্বার আবেগে মহাশ্মশান হয়েছে গীতিমুখর। সমসাময়িক কালে গীতি কবিতার কুলপ্লাবী তরঙ্গ এবং বাঙ্গালী কবির উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন ঐতিহাসিক মহা সংগ্রামের সমস্ত কোলাহলকে স্তব্ধ করে বেদনার করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলেছে। মহাশ্মশান কাব্যের গানগুলো কবির ব্যক্তি-চিত্তের বেদনাকেই ব্যক্ত করেছে। দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যে বিপুল দুঃখ তাঁর জীবনে সঞ্চিত হয়েছিল সম্ভবতঃ তারই ফলে কবি-কণ্ঠ বেদনা ভারাক্রান্ত। পাখীকে উদ্দেশ্য করে যে গানটি গীতিকবিতা হিসেবে তা উল্লেখযোগ্য। কবি কীটস নাইটীঙ্গলকে লক্ষ্য করে যেমন তাঁর জীবন সম্পর্কে ধারনা তথা বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করেছেন ঃ

Fade far away, dissolve and quite forget
What thou among the leaves hast never known ;
The weariness, the fever and the fret
Here, where men sit and hear each other groan ;

এবং দুঃখময় সংসার ছেড়ে নাইটীঙ্গলের সঙ্গে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করতে চেয়েছেন, কায়কোবাদও তেমনি পাখীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছেন ঃ

এখানে থাকিলে পাখি অন্ধ হবে দুটি আঁখি
পাবি শুধু বুকভরা ব্যাথা !

অবশেষে তিনিও পাখির সঙ্গে কল্পলোকে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন ঃ

গগণে উধাও হয়ে
প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে
তব সনে ভুঞ্জি স্বর্গ সুখ।

কবি কীটসের মত ভাব ও ভাষার সমৃদ্ধি 'পাখি' গানের মধ্যে না থাকলেও দুজনের কল্পনায় ক্ষীণ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কায়কোবাদ যে মহাকাব্য লেখার সঙ্কল্প করেছিলেন তার মধ্যে সঙ্গীতের অবকাশ না থাকলেও মহাশ্মশানের অন্তর্গত গানগুলি কাব্যের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যের সুরকে গভীর করে তুলেছে। দেশের রাজ-নৈতিক সংঘাতের মধ্যে নরনারীর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাকে কবি মর্মান্তিক রূপ দান করেছেন। অগণিত বীর যোদ্ধার রণহুঙ্কার ছাপিয়ে মানুষের আশাভঙ্গের বেদনাময় বৈরাগ্যের সুরটি প্রধান হয়ে উঠেছে। কাব্য সমাপ্ত করে পাঠকের মনে এই বৈরাগ্য-সঙ্গীত অনুরণিত হতে থাকে ঃ

নিবাও প্রাণের আশা নিবে যাক ভালবাসা
কেন সখা নিতি নিতি এত জ্বালা স'বে
নিবে যাক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি
আঁধার আঁধার শুধু ভবে।

মহাশ্মশান কাব্যের অনেকখানি ঐতিহাসিক প্রণয়-কাহিনী বা ঐতিহাসিক ট্রাজেডির রূপ পেয়েছে। মানুষের দেহাশ্রিত কামনা বাসনার যে ব্যাপক ও গভীর অভিব্যক্তি সমসাময়িক কালের কথা সাহিত্যে পাওয়া যায় কায়কোবাদের শিল্পী মন তাকে, হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর কাব্যের বীরবৃন্দ পানিপথ যুদ্ধের মহা আয়োজনে ব্যাপৃত—দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজাতির জন্য তাদের উৎকণ্ঠার অবধি নেই। আসন্ন সংঘাতের ভাবনা তাদের বিচলিত করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের হৃদয় রাজ্যে। সে রাজ্যের অধিশ্বরী হচ্ছে নারী। তবু কবির সচেতন মন দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধকে জাগ্রত করার প্রয়াস করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে পুরুষ চরিত্রের প্রধান গৌরব বীরত্ব। আর বীর পুরুষ ভোগ বিলাসের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না—

"সে সদা কৃপাণ হস্তে রণ মদে মাতি
স্বদেশের—স্বজাতির—স্বধর্ম্মের তরে
যুঝি শত্রু সনে, প্রাণ করে বলি দান।

কিন্তু মহাশ্মশান কাব্যের বীর পুরুষের 'কৃপাণ হস্তে' বার বার ছুটে গিয়েছে নারীর কাছে। অবশেষে যখন তারা স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য প্রাণ বলিদান করেছে তখন তাদের শ্মশানে ও গোরস্তানে বসে হাহাকার করেছে নারী। বেদনার যে ফল্গুধারা মহাযুদ্ধের অন্তরালে প্রবাহিত হচ্ছিল তাই প্রবল আর্তনাদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

মহাশ্মশান কাব্যে কবির ভাব এবং পরিকল্পনা বিশাল। কিন্তু তাঁর ভাবের রূপাশ্রিত মূর্তি তিনি সার্থকভাবে প্রকটিত করতে পারেন নি। কাব্যের চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ ও দুর্বল, আখ্যান শ্লথবদ্ধ, আকস্মিক ঘটনার হোচট খেয়ে পাঠককে অনেকখানে থেমে যেতে হয়, দীর্ঘ বক্তৃতা ও অহেতুক বর্ণনায় ক্লান্ত হতে হয়। ফলে তাঁর কাব্য রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি না হয়ে বিবৃতি বহুল, অসংযত উচ্ছ্বাসপূর্ণ, মিলহীন পদ্য-স্তূপে পরিণত হয়েছে। মহাকাব্যের মধ্যে যে মহিমান্বিত শিল্প-কৌশল, অপূর্ব সংযম এবং সুনিপুণ প্রকাশভঙ্গি থাকা প্রয়োজন মহাশ্মশান কাব্যে তার নিতান্ত অভাব

পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘ বীরগাথা রূপে কাব্যটি যে মর্যাদা পেতে পারতো চরিত্র সৃষ্টি সার্থক না হওয়ায় তা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে বীর রসকে প্রকটিত না করে কবি বহু আকস্মিক ও অবান্তর ঘটনার অবতারণা করেছেন এবং অবিরাম যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে কনক লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর নিকট দেবরাজ ইন্দ্র যখন চিরশত্রু মেঘনাদ সম্পর্কে বলেন ঃ

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি। এ দম্ভোলি;
বৃত্রাসুর চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে ...
অস্ত্র-বলে মহাবলী, তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার।

কিম্বা বিরহিনী প্রমীলার স্বামী সন্নিধানে যাত্রাকে লক্ষ্য করে রামচন্দ্র যখন মিত্র বিভীষণকে বলেন ঃ

নাঁ দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান গিরি—
সদৃশ অটল যুদ্ধে। কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে !
একে কি করিব, কহ রক্ষকুল মণি !
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিণে ;
কে রাখে এ দুগ পালে ?

তখন দুর্দ্ধর্ষ মেঘনাদের বীরত্ব সম্পর্কে পাঠকের মনে সংশয়ের অবকাশ থাকেনা। কিন্তু মহাশ্মশান কাব্যে যখন কোন বীর পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে বলে ঃ

দেখিব এখনি
রে পাষণ্ড, কোন বাপে রক্ষে আজি তোরে ?
একটি একটি করি দন্তগুলি তোর
উৎপাটিব নরাধম অস্পৃশ্য পামর ;
(৩য় খণ্ড, ২য় সর্গ)

তখন গ্রাম্য ঝগড়ার ঊর্ধ্বে কোন বিশেষ চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়না।

মহাশ্মশান কাব্যে অসংখ্য ঘটনা, অগণিত চরিত্র এবং সুবিশাল কাহিনী যথাযথ ভাবে বিন্যস্ত না হওয়ায় পাঠকের মনে কাব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হতে পারে না। কবিতার মধ্যে ভাষা তথা শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা মানবহৃদয়ের সুকুমার

অভিব্যক্তিকে রসমূর্তি দান করে কিন্তু কায়কোবাদের কাব্যে সুযোগ থাকলেও ভাষার দুর্বলতার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাব্যের প্রথম খণ্ডে পঞ্চদশ সর্গের উল্লেখ করা যায়। দিলীপের লালসা থেকে অমরেন্দ্র তাঁর প্রেমিকা হিরণকে মুক্ত করে সুরাট নগরে বিপ্রদাসের কুটীরে উপস্থিত হয়েছেন। হিরণকে সেখানে রেখে তিনি দেশের কল্যাণ সাধনার্থে যাত্রা করবেন। প্রেমিকার কাছ থেকে প্রেমিকের বিদায়কালীন উক্তি ঃ

পঞ্চদশ বর্ষ দেবি থাকি এক সঙ্গে
যোগাশ্রমে, কত কিছু বলেছি বকেছি,
করেছি কতনা রাগ কত কথা নিয়ে,
তবু তুমি একবার কওনি আমারে
কোন কথা, ক্ষণতরে হওনি বিরক্ত।

কবিতার স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দন না থাকায় এবং ভাষা আড়ষ্ট হওয়ায় উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করতেও কষ্ট নয়। নবীন প্রেমিক প্রেমিকার আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা-বিহ্বল মুহূর্তটির মধ্যে, যে অশ্রুসজল স্নিগ্ধ কমনীয়তা থাকে, তার লেশমাত্র এখানে আছে বলে মনে হয় না।

সংযমের অভাব মহাশ্মশান কাব্যের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। প্রথম খণ্ডের ঊনবিংশ সর্গে আদর্শ বীরাঙ্গনা জোহরা বেগম নজীবদ্দৌলাকে নারীর প্রকৃত মহিমা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন ঃ

তারা এ জৈব জগতে
মহামণি, মানবের অশান্ত হৃদয়ে
শান্তি দিতে বিধাতার প্রীতি-নির্ঝরিণী।

এ পর্যন্ত বেশ সুন্দর কিন্তু কবি এখানে ক্ষান্ত হননি, পণ্ডিতী ব্যাখা আরম্ভ করেছেন ঃ

ভোগবিলাসের বস্তু কামের পুতুল
নহে তারা, বিধাতার এ বিশ্ব ভবনে
জন্ম শুধু বীরপুত্র করিতে প্রসব
জগতের মঙ্গলার্থে, ধ্বংসি পাপরাশি
বিধাতার শুভকার্য্য করিতে সাধন।

একই কারণে মহাশ্মশান কাব্যে কোন কেন্দ্রগত চরিত্র পাওয়া যায়না। কাহিনীর সংগতিহীনতা কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশকে অসম্ভব করে তুলেছে।

ঐতিহাসিক পানিপথ যুদ্ধের নায়ক আহমদ শাহ আব্দালী কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করলেও তাঁকে কেন্দ্রগত চরিত্র হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

কায়কোবাদ তাঁর কাব্যে 'চর্বিত চর্বন' করেন নি বলে অহঙ্কার প্রকাশ করলেও পরানুকরণের দৈন্য পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যর্থ অনুকরণ, নামধাতুর ব্যবহার, নিয়তির অমোঘ বিধান এমন কি হুবহু শব্দ গ্রহণ করে তিনি মাইকেল মধুসূদনের কাছে ঋণের ভার বৃদ্ধি করেছেন, কাব্যের উৎকর্ষ বিধান করতে পারেন নি।

বিপুলায়তন মহাশ্মশান কাব্যে গুণের অভাব না থাকলেও ত্রুটির পরিমান পরিমিত নয়। তবে কবি তাঁর সমালোচকদের লক্ষ্য করে বলেছেন—

"সজ্জন গুণ খোঁজে, দোষ খোঁজে পামর
মক্ষিমা ব্রণ খোঁজে, মধু খোঁজে ভ্রমর।"

অতএব বেশী না এগোনই ভাল!

কায়কোবাদ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দুই কালকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য প্রেরণাই মূলতঃ তার কবি-কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। নগর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সমাজে নানা প্রকার চিন্তা ও চেতনার যে বিবর্তন ঘটছিল কবি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি বিশ শতকেও ঊনিশ শতকের সাধনা করেছেন এবং তারই নিদর্শন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জ্জন কাব্য"। জাতীয় আখ্যান কাব্যের ধারায় এটি সম্ভবতঃ বয়ঃ কনিষ্ঠ। তবে কবি কাব্যের প্রথমে "কৈফিয়ৎ" দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'মহরম শরিফ' রচনার পরিকল্পনা ত্রিশ বৎসরের! কবির কথা ঃ "ভূত পূর্ব্ব "সুধাকর" ও "ইসলাম প্রচারক" সম্পাদক ও নানা গ্রন্থ প্রণেতা বন্ধুবর মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন আহমদ সাহেব অনেক দিন হইল মহরমের যথাযথ ইতিবৃত্ত লইয়া আমাকে একখানা কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা এখনও আমার স্মরণ আছে,...এরূপ অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্য—মীর মোশারফ হোসেন সাহেব কল্পনারাজ্যের কতগুলি অবান্তর কথা লিখিয়া ঘটনা উপন্যাস আকারে সাজাইয়া ইসলামের হৃদয়-পঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিলেন। মীর সাহেব যদি মহরমের চিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত করিতেন তাহা হইলে মোস্লেম সমাজ তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইত, আর আমাকেও এই "মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জ্জন" কাব্য লিখিবার জন্য এতটা কষ্টভোগ করিতে হইতনা।"

বিষাদসিন্ধুর কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে মশাররফ হোসেন ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কায়কোবাদ সেটাকে মনে করেছেন 'ইসলামের হৃদয় পঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত।' বিবি জয়নবের রূপবিভ্রম, জায়েদার সপত্নী-বিদ্বেষ, সখিনা ও কাসেমের প্রেম প্রভৃতি কবিকল্পিত ঘটনার যে চিত্র পুথি সাহিত্য থেকে বিষাদ সিন্ধুতে এবং বিষাদসিন্ধু থেকে পরবর্তী বহু কাব্যে রূপ লাভ করেছিল সে সবকে তিনি ঘোর অনাচার জ্ঞান করেছেন। কায়কোবাদের কথায়—"সমস্ত "বিষাদসিন্ধু"—"কাসেম—বধ"—"মহরম চিত্র"—"শহিদে কারবালা" ও "জঙ্গনামা" প্রভৃতি গ্রন্থ ভরিয়াই কেবল এই সব পূতিগন্ধময় রাবিশ, কেবলই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বাজে কথায় পরিপূর্ণ, ইহাতে সত্যের ভাগ খুব অল্প।" বিষাদসিন্ধু গ্রন্থের জনপ্রিয়তা দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন—"এতগুলি দোষত্রুটী থাকা সত্ত্বেও বহু মুসলমান ও বহু সাহিত্যিক এই রাবিশপুর্ণ "বিষাদ সিন্ধুকে" লইয়া ঢেঁড়রা পিটিতেছেন; এমনই অধোপতিত বঙ্গদেশীয় মুসলমান আমরা।" তাঁহার মতে—"পুনঃ পুনঃ স্বজাতির এইরূপ মিথ্যা কুৎসা লিখিতে যাহারা দ্বিধা বোধ করেননা, সাহিত্যের পুণ্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই।"

'মহরম শরিফ' কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি 'অনৈতিহাসিক' এবং 'কাল্পনিক বাজে কথার' আশ্রয় নেননি। তিনি বলেছেন—'কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কল্পনার সাহায্য লইয়া কোনরূপ ঘটনার অবতারণা করি নাই।'

তিন খণ্ডে বিভক্ত মহরম শরিফ কাব্যের প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বাদশ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে চতুর্থ সর্গ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭০; আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মহাশ্মশান কাব্যের মত এতে গান নেই তবে পাদটীকায় বহু গ্রন্থের সমর্থন দিয়ে তিনি কাব্যকে ঐতিহাসিক প্রমাণে পরিশুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে সূচনায় কবি বলেছেন: "এই কাব্য লিখিবার সময় মহরম সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ আছে, আমি তাহাদের প্রায়গুলিরই কিছুনা কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি; অন্যান্য গ্রন্থকারদের মত জয়নবের নেকাহ, যায়েদার বিষদান, হজরত কাছেমের (রাঃ) সহিত বিবি সখিনার (রাঃ) বিবাহ ও আত্মহত্যা, এই সব পূতিগন্ধময় মিথ্যা কথা লিখিয়া আমার কাব্য আমি কলঙ্কিত করি নাই।"

আটঘাট বেঁধে, কল্পনার সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে কবি যে কাব্য রচনা করেছেন তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়নি। সমগ্র 'মহরম শরিফ' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধের সমষ্টি হয়েছে।

কায়কোবাদের এই অ-কবি মনোভাব নিয়ে কাব্য রচনার তাগিদ এসেছে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্ত্তব্যবোধ থেকে: "কয়েকজন অদূরদর্শী মুসলমান লেখকের অবিমৃষ্যকারিতায় ও মিথ্যা কাল্পনিক লেখার দরুন বঙ্গীয় মুসলমানগণ মহরমের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যদি তাঁহারা এই কাব্য পাঠ করিয়া মহরমের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত হন তবে আমি অশেষ পুণ্যের ভাগী হইব।"

মহরমের নির্ভুল ইতিবৃত্ত প্রচার করে পুণ্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ কবি 'মহরম শরিফ' রচনা করেছেন। ধর্ম প্রচার, পুণ্য সঞ্চয়, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঊনিশ এবং বিশ শতকের অধিকাংশ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন কিন্তু তুই কুল রক্ষা করতে পারেননি। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সবিশেষ প্রচেষ্টা তাঁদের সৃষ্টিকে ব্যর্থ করেছে। মহরম শরিফ কাব্য তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শেখ ফজলল করিম প্রণীত পরিত্রাণ কাব্য ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাব্যের কতকাংশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মধুমিঞা সম্পাদিত প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'অবতরণিকা'য় কবি বলেছেন—"তিন বৎসর পূর্বে এই পুস্তকের কতকাংশ 'প্রচারক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে "প্রচারকের" প্রচার শেষ হওয়ায় আর কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই।" মনে হয় 'পরিত্রাণে'র রচনাকাল ঊনিশ শতকের শেষ দিকে। যথাযথ সুযোগের অভাবে বিশেষ করে আর্থিক অসুবিধার জন্যই কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এ কালের প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক মুনশী মেহের উল্লা কবিকে কাব্য প্রকাশে সাহায্য করেন। 'অবতরনিকা'য় তার স্বীকৃতি আছে—"বঙ্গ বিখ্যাত মিশনরী, বাগ্মী প্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুন্শী মেহের উল্লা সাহেব গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কনে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।" এরই ফলে পরিত্রাণ কাব্যের প্রকাশক—"মোহাম্মদ মেহের উল্লা।"

পরিত্রাণ কাব্য রচনার মূলে আছে স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচারের উদগ্র কামনা। কাব্যের প্রথমেই কবি সে কথা ঘোষণা করেছেন—"চিরারাধ্য হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সাত্ত্বিক জীবনের কাহিনী,—ইস্লামের জন্য ও আমাদের জন্য অসাধারণ অত্যাগ,—কবি-তূলিকায় চিত্রিত করিবার আশায় পরিত্রাণ কাব্যের সৃষ্টি।"

১৪৩ পৃষ্ঠায় এ কাব্যটি ত্রিশ সর্গে বিভক্ত। মুসলিম সাহিত্য সাধিকগণের বহু গ্রন্থই এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে। আশঙ্কা হয়, কিছুকালের মধ্যে পরিত্রাণ কাব্যও

বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হ'য়ে যাবে। কাজেই কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ধরে রাখা দরকার।

কাব্য পাঠ—কাব্যের প্রত্যেক সর্গে প্রনুষ্ঠিত ঘটনার স্থান ও কালের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'প্রথম সর্গ।' আরব।—সাধারণ সভা-গৃহ।' নিষ্ঠুর মরু-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে সর্গের সূচনা হয়েছে ঃ

"মধ্যাহ্ন তপন-তীক্ষ্ণ খর কর-জালে
সন্তাপিত মরুবাসী তৃষ্ণায় কাতর,
ঝাঁ ঝাঁ করে দিগঙ্গনা লতা-পুষ্পহীনা
যেন সে বিধবা বেশ ; দীনা ভিখারিণী।"

দ্বিপ্রহরের উত্তাপ কোরেশ প্রধানগণ ইসলাম ধর্মকে অঙ্কুরে বিনাশ করার সঙ্কল্পে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাদের চিন্তা—

এ অঙ্কুরে বিষ-বৃক্ষ হইলে উদ্ভূত
ধ্বংস হবে দারাপুত্র প্রিয় পরিজন
বিহিত এ বিষ-মূল করা উৎপাটন!

দলপতি আবুসুফিয়ানের পরামর্শে তারা একমত হয়ে কোরেশদের আহ্বান জানালো—

ধর ধর সবে শাণিত কৃপাণ,
ভ্রূণে হত্যাকর আজি ইসলামের প্রাণ।

ইসলাম প্রচারক মহম্মদকে (দঃ) হত্যা করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। কোরেশদের এ উন্মত্ত আয়োজন চলা কালে দৈববাণী হয়েছে—

"ডুবিল—ডুবিল ওরে অজ্ঞান মানব
ফিরে দেখ পিছে অই ভীষণ নরক
লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া ডাকিছে তোদের ;
বৃথা যাবে অহঙ্কার, ভগ্ন-মনোরথে
জ্বলিবে আগুনে পুড়ি যুগ-যুগান্তর।

'দ্বিতীয় সর্গ। প্রান্তরে।' সন্ধ্যার প্রাক্কালে উন্মুক্ত প্রান্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বাঙ্গলার স্নিগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে আরব দেশের তুলনা করেছেন। এখানকার কঠিন প্রকৃতি মানুষের হৃদয়কে যেন কঠিনতর করেছে—

'খর করবাল করে মরণ এখানে
নাচিতেছে ঘরে ঘরে ;"

দেশ জুড়ে সেই তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে হজরত মহম্মদ শিষ্যদের নিয়ে আসন্ন বিপদে আল্লাহ তায়ালার সহায়তার কথা ভাবছেন। পথভ্রান্ত মানুষের জন্য তাঁর কোমল প্রাণ কেঁদে উঠেছে—

'দাও সাধু-মন্ত্র-বিন্দু আজি তাহাদের
লভুক নূতন আলো, আঁধার জীবনে,

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আকাশে দৈববাণী হয়েছে এবং ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নেওয়ার আহ্বান এসেছে—

"এক ভিন্ন দুই নাই রূপে গুণে রসে তাই
দেখিতেছ আমাকেই মিশিয়া থাকিতে,
অমৃত পিয়িতে যদি আশা থাকে নিরবধি
নম এসে ইসলামের রাঙ্গা চরণেতে।"

কিন্তু কোরেশগণ সে আহ্বানে কর্ণপাত না করায় তাদের উপর অভিসম্পাত নেমে এসেছে—

"অজ্ঞানতা অন্ধকারে ডুবিলে যখন,
তোমাদের যত গর্ব্ব হরিনু তখন!"

'তৃতীয় সর্গ। আবু সুফিয়ানের বিলাস-কক্ষ।' কতিপয় কোরেশ-প্রধান সহ আবু সুফিয়ান রমণীও সুরায় মত্ত হয়ে আছে। 'অচেতন যবে বিশ্ব শান্তি-নিকেতনে' তখন তারা 'ঢালিছে কাঞ্চন-পাত্রে বারম্বার সুরা।' এ ভাবে আমোদে প্রমোদে 'তৃতীয় প্রহর নিশা' আগত হলে সুফিয়ান সকলকে ডেকে বলেছে—

'আর না বিলম্ব সহে—লহ করবাল
লহ অসি বধ আজি ধর্ম্মের অরাতি।'

তারা বীরদর্পে হজরতকে হত্যা করার জন্য তাঁর গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়েছে কিন্তু গৃহের কাছে এসে 'বসিয়া পড়িল সবে—চলেনা চরণ।' অদৃশ্য শক্তি তাদের সমস্ত বল হরণ করে নিয়েছে। ওদিকে গৃহের মধ্যে হজরতের কর্ণে ধ্বনিত হয়েছে 'ভয় নাই—ভয় নাই, আমি আসিয়াছি' এবং 'বিধাতার বিকট সে মহান হুঙ্কার শুনে' তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

'চতুর্থ সর্গ। হজরতের পুরী-দ্বারে।' অন্ধকার রাত্রি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কোরেশ-দল প্রভাতের অপেক্ষায় গৃহ বেষ্টন করে বসে আছেন এমন সময় আলীর সঙ্গে দেহবাস পরিবর্তন করে হজরত গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অলৌকিক শক্তি ঘাতকদের—

'ঝলসিল চর্ম্ম-চক্ষু, না দেখিল অরি
প্রেরিতের অন্তর্ধান গবাক্ষের পথে।'

এবং প্রভাতে গৃহে প্রবেশ করে—

'পাপ চক্ষে পাপীগণ দেখিল চাহিয়া,
কেহ নাই,—আছে এক যুবক শুইয়া!'

'পঞ্চম সর্গ। পার্ব্বত্য পথে।' একমাত্র সঙ্গী আবু বকরকে নিয়ে হজরত মহম্মদ (দঃ) চলেছেন মদিনার পথে। পেছনে ধাওয়া করেছে কোরেশের দল। তাঁদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'গার-হোরা' পর্বত গহ্বরে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন এবং—

প্রবল শত্রুর অস্ত্র নিবারিতে বিভু
ঊর্ণনাভ-জাল-তলে কপোতের ডিমে
ভ্রান্তি উপজিলা সেথা কোরেশীর হৃদে!'

বহু চেষ্টাতেও হজরতের সন্ধান না পেয়ে—

'পরিশ্রান্ত শত্রু সেনা প্রাণপণ করি
ফিরিলা গৃহের-পথে;

ওদিকে হজরত 'সিদ্দিক সাথে গেলা মদিনায়।'

'ষষ্ঠ সর্গ। মক্কা;—আবু সুফিয়ানের গৃহে।' কোরেশ-প্রধানগণ একত্রিত হ'য়ে নানা পরামর্শের পর মদিনা আক্রমন করার সঙ্কল্প ক'রেছে—

'মদিনার সিংহাসন ঘুচাইব তার,
ঘুচাব প্রচার-সাধ—মিশাব ইসলাম।
মূলহীন জীর্ণ তরু পড়ে যথা ভূমে
তেমতি বিলুপ্ত হবে অঙ্কুরেই পাপ!'

'সপ্তম সর্গ। মদিনা;—হজরতের মস্‌জিদ-প্রাঙ্গনে।' আসন্ন আক্রমন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হজরত মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুধ হয়ে 'বীর দম্ভে একলক্ষে হয়ে আগুয়ান' হামজা যুদ্ধের শপথগ্রহণ করেছেন এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন—সমরে স্বদেশ তরে সাজরণে তবে।'

'অষ্টম সর্গ। মরু-পথে।' কোরেশ বাহিনী চলেছে মদিনা আক্রমন করতে। তাদের দম্ভ—"একেশ্বর বাদ দিব অতল সলিলে;" মুসলমানগণও সংবাদ পেয়েছেন—

'আসিছে কাফের
করিবারে অবরোধ শ্যামা জন্ম ভূমি;'

কাজেই—

'জীর্ণ ভগ্ন তরবারী করিয়া সম্বল
বদর প্রান্তর-পথে, চলিলা মোস্লেম।'

'নবম সর্গ। পর্ব্বত শিখরে।' মুসলিম সৈন্য শিবির স্থাপন করেছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

'চন্দ্রমা-শালিণী আহা কি মধু-যামিনী
স্নিগ্ধ তোয়া কমনীয়া কৌমুদী বিভায়
ফুটাইছে মহাপ্রেম প্রকৃতির বুকে ;
মেলিল সুচারুমুখী কুসুম-কলিকা
আনত-নয়ন, যেন ঊর্দ্ধে চাহি চাহি
কাতরে করুণা মাগে করুণা লয়ের
বরপদে বালা।'

সৌন্দর্যময় পর্বতশিখরে বসে হজরত যুদ্ধের চিন্তায় ব্যাকুল। সহসা 'জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মধুর আহ্বানে' তিনি সচকিত হয়ে দেখলেন 'স্বর্গ শ্রেষ্ঠ দূত' জিব্রাইল। তিনি তাঁকে বললেন—'প্রত্যুষে হইবে রণ, ভীম-প্রহরণে
রক্ষিবেন প্রভু নিজে স্বর্গীয় কৌশলে ;' শুধু তাই নয়—

'প্রয়োজনে সুসময়ে
পাঠাবেন পঞ্চ সহস্রেক ব্যোমচর।'

'দশম সর্গ। বদরে।' প্রভাতে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে—

'ঝম্ ঝম্ ঝম্ রবে কোরেশী বাজনা
বাজিয়া উঠিল দূরে
যেন রে রাক্ষস পুরে
পিশাচ উৎসব-মগ্ন আনন্দে অধীর
ওদিকে সাজিল শত মহম্মদী বীর।'

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। দু'পক্ষই স্বধর্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কোরেশ রমণীরা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদের পশ্চাতে থেকে তাদের উৎসাহিত করে চলেছে—

কার্ম্মুক টঙ্কারি সবে ডুবাও ইসলামে
শোনিতে তর্পণ করি
চলরে মক্কায় ফিরি
দেবতার নামে প্রাণ বিলাইয়া দাও
কোরেশী অমর হোক্ যাও চলে যাও !'

কোরেশরা উৎসাহ পেয়ে 'মত্ত প্রভঞ্জন প্রায়' মোসলেম বাহিনীকে আক্রমণ করেছে এমন সময়—

'প্রেরিত দেখিলা চেয়ে,
জ্যোতিতে আকাশ ছেয়ে
স্বর্গ হতে নামিতেছে শূর-ব্যোমচর,
উলঙ্গ কৃপাণ করে ;—প্রফুল্ল অধর।

ব্যোমচর সৈন্যের আক্রমণে কোরেশ যোদ্ধারা বিপর্যস্ত হলেও তারা প্রাণপণে লড়াই করেছে। নিজেদের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা যে কোন রকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত—

'নরকের লোল বহ্নি গ্রাসিবে কোরেশে
তাও তা'রা সহি নিবে
দাসত্ব না স্বীকারিবে
পরের পাদুকা নাহি লইবে রে শিরে
রক্ষিবেন দেবরাজ এ কাল সমরে।'

কিন্তু স্বর্গীয় সেনার সামনে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। এভাবে বদর যুদ্ধে—

'পুণ্যের হইল জয় পাপ হ'ল ক্ষয়।'

'একাদশ সর্গ। মদিনা ;—মসজিদ প্রাঙ্গণে।' বিজয়ী মুসলমানগণ সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছে। কবি কল্পনায় সে গৌরবময় দৃশ্য অবলোকন করেছেন—

'ছোট নাই—বড় নাই—সকলি সমান,
এমন ভ্রাতৃত্বে বদ্ধ ইস্‌লামের প্রাণ।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বর্ত্তমানকে মনে পরেছে—দেশ পরাধীন, বঙ্গ ভাষা মলিন এবং মুসলমানগণ দীন হীন। তিনি আশা করেছেন অতীতকে উদ্ঘাটিত করতে পারলে সুপ্ত মুসলমান জেগে উঠবে।

মসজিদ প্রাঙ্গনে বসে হজরত মহম্মদ (দঃ) বন্দী কোরেশদের বিচার করেছেন। তিনি তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তারা--

'ভক্তিভরে যুড়ি পানি কহিলেক সবে—
"এক সত্য,—মহম্মদ (দঃ) প্রেরিত তাঁহার
উপাস্য নাহিক কেহ তিনি ভিন্ন আর।"

কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হোল তাদের দাসত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে—

'ধর্ম্মাসন ত্যাজি
সভা-ভঙ্গে ভাববাদী চলিলেন আজি।'

'দ্বাদশ সর্গ। মসজিদে।'—

'কন্যাশোকে শোকাতুর প্রভু মহম্মদ (দঃ)
পার্শ্ব চর পরিবৃন্দ উদাস-নয়ন,
বিষাদ-বিক্ষুব্ধ যেন ব্যথিত হৃদয়
মর্ম্মভেদী নিরাশার নিদারুণ তাপে।'

কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখে পরিতাপ করার তার অবকাশ কোথায়! খবর এসেছে, কোরেশ বাহিনী আবার মদিনা আক্রমনে অগ্রসর হচ্ছে। 'পিশাচী হেন্দা' তাদের প্রেরণা দিচ্ছে, এবার তাদের উৎসাহ যেন আরও প্রবল। মুসলমানগণ তাদের মোকাবেলা করার জন্য ওহোদ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন—

'বুভুক্ষু কেশরী যথা শোণিত-আস্বাদে,
তেমতি ইসলাম-সৈন্য রক্ত-প্রত্যাশায়;
পিপীলিকা শ্রেণী হেন—ত্রিভুবন জয়ী—
স্ব-বন্ধু-বান্ধব-হীন চলিলা ওহোদ।'

এদিকে নির্জন মদিনা নগরী—

'স্বামীহারা সতী যথা, জনহীন মরু—
কাঁদিলা তেমতি তিনি মনিহারা ফণী,
বিরহ বিধুরা সুপ্ত মদিনা নগরী।'

'ত্রয়োদশ সর্গ। রাত্রিকাল,—ওহোদে।' 'তমোময়ী তমস্বিনী—গাঢ় অন্ধকার,' শিবিরে 'মদমত্ত সুফিয়ান' ঘুমের মধ্যে তিনটি স্বপ্ন দেখেছে। প্রথম স্বপ্নে ইসলাম মূর্ত্তি ধারণ করে সুফিয়ানের সামনে আবির্ভূত হয়েছে—'আমি রে ইসলাম ধর্ম্ম ওরে দুরাচার'। অনেক ধিক্কার দিয়ে তাকে আসন্ন পতনের ভয় দেখিয়েছে—

'দেখিবি আগামী রণে দরিদ্র ইস্‌লাম,
দৈব-শক্তি সমবায়ে সমর-সাগর
কেমনে লঙ্ঘিবে, তোর নিশ্চয় পতন।'

দ্বিতীয় স্বপ্নে যুদ্ধে নিহত 'অভাগা জেহেল' কেমন ভাবে 'ভীষণ নরকে প'ড়ে' যন্ত্রণা ভোগ করছে সে কথা বলে সুফিয়ানকে সাবধান করেছে—

'সাবধান, সাবধান ওরে মূঢ়মতি !
আমি বুঝিতেছি এবে
ইসলামেরে নাহি সেবে
কি অন্যায় করিয়াছি ;—এ ভুলের ফলে,
অনন্ত নরক বাস আমার কপালে !'

তৃতীয় স্বপ্নে 'দুরদৃষ্ট ওতবার' নরক যন্ত্রনার বিবরণ শুনতে শুনতে—

'পাপী দেখিলা বিস্ময়ে
নিশা অবসান !

'চতুর্দ্দশ সর্গ। সমর-ক্ষেত্র।' বিশাল কোরেশ-বাহিনী দেখে মুসলমানদের মনে আশঙ্কা দেখা দিলে দৈববাণী তাদের সাহস যুগিয়েছে—

'নিশ্চয় এবারো রণে জিনিবে ইসলাম ;
বিধাতার বিধি কেহ নারিবে খণ্ডাতে;'

ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েও হজরতের আদেশ লঙ্ঘন করায় সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। শত্রুর প্রস্তরাঘাতে হজরতের দন্ত চূর্ণ হয়ে রক্তে বক্ষ প্লাবিত হয়েছে এবং—

'হৃদয়-শোণিত দানে রঞ্জি রণ স্থল,
আবার ইসলামে প্রদানিলা বল।'

মুসলিম যোদ্ধারা আবার সংগঠিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেছে। 'পঞ্চাদশ সর্গ। মদিনা, দিবা তৃতীয় প্রহরে।' 'সুদীন আসনে বসি মহান পুরুষ' মহম্মদ (দঃ) সহচরদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। খবর এসেছে য়িহুদীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে 'বিস্তীর্ণ খয়বর প্রান্তে নাশিতে ইসলামে।' কাজেই 'সাজিল মোসলেম-সেনা বধিবারে অরি।'

'ষোড়শ সর্গ। খয়বরে।' য়িহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ। মুসলমান সৈন্যের আক্রমনে—

'ফেরুপাল ব্যাঘ্র হেরি যথা
জীবন রক্ষার আশে,
বিজনে পলায় ত্রাসে,
তেমতি য়িহুদী দল হায়
যেদিকে পাইল পথ লইল আশ্রয়।'

ফলে—'ইসলাম লভিল জয় খয়বর প্রাঙ্গণে।'

'সপ্তদশ সর্গ। মদিনা ;—মসজিদ-প্রাঙ্গণে।' রসুলুল্লাহ শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। কোরেশরা 'নাশিতে ইসলাম-রাজ্য—সুখ-স্বাধীনতা' ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য হজরত সকলকে আদেশ দিয়েছেন—

'যাও তবে গৃহ-মুখে কর আয়োজন,
একবার পশি সবে মক্কার ভিতরে,
ইসলামের শেষ ভেরী করি নিনাদিত,
চূর্ণ করি অহঙ্কার যত দেব বল।'

হজরতের আদেশে সকলের দেহে 'উষ্ণরক্ত-স্রোত যেন গেল তরঙ্গিয়া' এবং যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করতে 'চলিল মোস্লেম দল নিজ ঘরে ঘরে।'

'অষ্টাদশ সর্গ। মক্কা প্রান্তরে।' বিশাল মুসলমান বাহিনী শিবির সন্নিবেশিত করেছেন। 'চির পুণ্যশীল' কল্পনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে কবি সে দৃশ্য দেখছেন। মুসলিম সৈন্যরা 'মানব-নামের কালি,—মূর্ত্তিমান পাপ' আবু সুফিয়ানকে শৃঙ্খলিত করে হজরতের সামনে হাজির করেছে এবং সে অনুতপ্তচিত্তে প্রার্থনা জানিয়েছে—'পুরাও ইসলামে বাঁধি যাক্ অপবাদ।' মুগ্ধ কবি পাঠককে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

'ভ্রমে পড়ি কেন ওরে অজ্ঞান মানব,
আজিওনা চিনিতেছ হেন কোহিনুরে ;
অই ডুবে কালস্রোতে জীবনের-বেলা
আর না ফিরিবে আয়ু।'

—কাজেই—'আইস,—এখন ভজ ইসলামেরে ভাই !' পরদিন 'ভীম প্রভঞ্জন সম' কোরেশ সৈন্যরা মুসলমানদের আক্রমণ করেছে কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। বিজয়ী অনুচরদের লক্ষ্য করে হজরত বলেছেন।—

'আজি প্রায় ব্রত শেষ—হ'তেছে পূরণ
আমার প্রাণের সাধ। পৌত্তলিক ভূমি
হইল সত্যের রাজ্য ; করহ বিশ্রাম !
মধ্যাহ্নের উপাসনা করি সমাপন।,
সাফায় করিব মহাসভা আহ্বান।'

'ঊনবিংশ সর্গ। সাফা পর্ব্বতে।' 'আহূত বিরাট-সভা'য় হজরত সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁর বাণী শুনে—

'মুগ্ধ মধুকর যথা মকরন্দ পানে
মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হয় আপনার কথা,
তেমতি কোরেশ-দল শুনি এ বচন
দলে দলে ইসলামেরে করিল গ্রহণ।
পাপ-রাজ্যে পুণ্য আসি লভিল আসন
মরুভূমি হ'ল আজ নন্দন-কানন !'

'বিংশ সর্গ। ব্রত-উদযাপন,—পরিত্রাণ।' কাব্যের কাহিনী উনবিংশ সর্গেই সমাপ্ত হয়েছে। এ সর্গে কবি যেন নিজেই 'ব্রত-উদযাপন' করেছেন, ইসলামের মহিমা কীর্ত্তন করে, বিশ্ববাসীকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি নিজের পরিত্রাণ কামনা করেছেন।

'লও কোলে ;—কি দেখিছ ওরে রে জগত
চিরোজ্জ্বল পবিত্র ইসলামে ?
কোটী কোটী নরপ্রাণ
আজি এই অবসান,—
হইতেছে ত্রয়োদশ শতাব্দি ব্যাপিয়া,
একি সুর—একি লক্ষ্য—এক স্বরে উঠে
জীবনের কামনা লইয়া।

সহায় সম্বলহীন চিরদরিদ্র হজরত মহম্মদ (দঃ) একমাত্র সত্যের জ্যোতিতেই ইসলামের গৌরব জগতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বাহুবলের দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে এমন অপপ্রচার যারা করে কবি তাদের নির্বোধ জ্ঞান করেন ঃ

'সঙ্গীহীন—বিত্তহীন—নির্ধন কাঙ্গাল
হয় যদি জগতের গুরু ;
কে এমন মূর্খ ওরে
তাহারে বলিতে পারে,—
"এক হস্তে অসি আর কোরান লইয়া,
মহম্মদ দ্বারে দ্বারে অনিচ্ছার মাঝে
এ ইসলাম গে'ছে প্রচারিয়া ?"

তিনি 'ছত্রে ছত্রে বিশ্বকাব্য করিয়া মন্থন' একমাত্র ইসলাম ধর্মেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। সেই অমৃতের স্পর্শে 'পরিত্রাণ' লাভের প্রার্থনা জানিয়ে কবি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছেন ঃ

ভ্রমে দৈন্যে পথভ্রান্ত সংসার-সাগরে
ধরিয়াছি ইসলাম তরণী ;
সত্যে যেন থাকে মতি
সেবকের এ মিনতি,
আলোকে-আলোকে যেন হয় অবসান,
ও রাজীব পদ-তলে, কালিমা মুছিয়া
অভাগার ক'রো পরিত্রাণ !

'পরিত্রাণ' জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে লিখিত। এতে লেখকের ধর্মবোধ, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি কিছু উগ্ররূপেই প্রকটিত হয়েছে। সর্গ বিভাগ, যুদ্ধ বর্ণনা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মাইকেল প্রবর্তিত কতিপয় শব্দ ব্যবহার করে যে বিশেষ ধরণের কাব্য রচনার প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কবিগণ করেছিলেন, তাকে ফজলল করিম অত্যন্ত সচেতন ভাবেই অনুসরণ করেছেন। কবির মৌলিকত্ব হচ্ছে ইসলাম ধর্ম এবং উক্ত ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। ফলে 'পরিত্রাণ' যতটা কাব্য তার চেয়ে বেশী হচ্ছে ভক্ত মনের ভক্তি প্রচার। এবং সে ভক্তির অবলম্বন অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। যে বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম ও যুগ ধর্ম-বিরোধী। কাজেই সাহিত্যের আসরে এ কাব্য কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। কবির ঐতিহ্যসচেতনতা, স্বজাতির দুর্দশায় উৎকণ্ঠা, পারলৌকিক মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং বীর গাথা রচনার একটি নিদর্শন হচ্ছে পরিত্রাণ কাব্য।

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত 'হজরত মহাম্মদ' কাব্যের (মোজাম্মেল হক্ রচিত) সঙ্গে অনেক সময় ফজলল করিমের কাব্যটির তুলনা করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু উভয় কাব্যের বিষয়বস্তু বা রচনা কৌশলে কোন মিল নেই। 'হজরত মহাম্মদ'—রসুল-লুল্লার আংশিক জীবন রচিত। কবি কাব্যের বিজ্ঞাপনে বলেছেন : "আজ আমি হৃষ্টচিত্তে "হজরত মোহাম্মদ"—চরিতামৃত হস্তে লইয়া সর্ব্বসম্মুখে উপস্থিত হইতেছি।" এ কাব্যে সর্গবিভাগ নেই, যুদ্ধ বিবরণ নেই, স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য কোন দুর্ভাবনারও পরিচয় নেই। 'চৈতন্য চরিতামৃতের" মত একটি চরিত রচনার চেষ্টাই কবি করেছেন এবং সে জন্যই 'ইহাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ' লিখিত হয়েছে।

পরিত্রাণ কাব্যে কবি 'বঙ্গভাষা'র প্রতি মুলমানদের অবহেলায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

শক্তি আছে, সাধ্য আছে বঙ্গ-সন্তানের,
কেবল আসক্তি নাই উপরে মায়ের! (পৃ—৮৩)

সমালোচকদের কটাক্ষ করে বলেছেন—

ভাগ্য দোষে কবি-জন্ম নিলে,
অণুপরমাণু-তত্ত্বে জীবন নিঃশেষ!
তা'তে বা সাবাশী কই? ভ্রূকুটী করিয়া
কতজনে উপহাসে—তুচ্ছি চলে যায়,
বলে—"ওটা প্রমত্ত পাগল!" (পৃঃ—১০৪)

এর ফলে, ১৩১১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা নবনুর পত্রিকার 'গ্রন্থ-সমালোচনা'য় কঠোর মন্তব্য করে বলা হয়—"সমালোচকের প্রতি অনর্থক ভ্রূকুটী ও বঙ্গভাষার জন্য শুষ্ক কান্না রাখিয়া দিয়া যদি তিনি স্বাভাবিক সরল পথে চলিতেন, তাহার এই কাব্যখানি বেশ উপাদেয় ও মনোজ্ঞ করিতে পারিতেন, তাঁহার সে শক্তি যথেষ্ট ছিল।" কবির প্রধান ত্রুটি বলা হয়েছে, ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব ঃ "এই কাব্যের কবি শব্দ-সম্পদে যথেষ্ট সম্পন্ন তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু একমাত্র ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাবে—'গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়'।" নবনুরের গ্রন্থ সমালোচনার হুল এবং বিষ দুটোই প্রখর এবং নবীন লেখকদের ক্ষেত্রে তা প্রায়শঃই মর্মপীড়ার কারণ ছিল।

আবুল-মা-আলী মহাম্মদ হামিদ আলী আখ্যান কাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে মোট চার খানা কাব্য রচনা করেন। তার প্রথম কাব্য 'ভ্রাতৃবিলাপ'। এ পর্যন্ত কাব্যখানা আমার দেখার সুযোগ হয়নি তবে সমসাময়িক কালের পত্র পত্রিকায় এর কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে।

খুব সম্ভব ১৩১০ সালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, 'ভ্রাতৃবিলাপ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর কবিতা ও কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াস এবং সে প্রয়াসের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ব্যক্তিগত দুঃখ থেকে। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন ঃ "ইতিপূর্ব্বে আমি বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক লিখি নাই—কোন পত্রিকায় কোন কবিতাও লিখি নাই (আমার বাঙ্গালা শিক্ষার ইতিহাস শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়)···কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মনে আঘাত প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা

পরিবর্ত্তনে কোন কোন অতীত কবিবৃন্দের কবিত্ব-শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। ভ্রাতৃ-বিয়োগে আমারও কাব্যোচ্ছ্বাস। তাই, মাতৃভাষার সেবা আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা, তাহার পরীক্ষার্থে ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশ।" কিন্তু সমালোচকের বিচারে, অন্ততঃ নবনূর সম্পাদকের দৃষ্টিতে, হামিদ আলী 'পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ১৩১০ সালের মাঘ সংখ্যা নবনূর পত্রিকার 'গ্রন্থ সমালোচনায়' ভ্রাতৃবিলাপ কাব্যটির নির্মম সমালোচনা করা হয়—"এখানি কাব্য। মহাকাব্য কিনা, কোথাও লেখা নাই। ইহাতে ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র আছে, খণ্ড ও সর্গ আছে! কেবল কি ইহাই? ইহাতে সমালোচকের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ আছে, স্বর্গীয় মাইকেলের পিণ্ডের যোগাড় আছে। আর কিছু নাই? ইহাতে 'কান্না-কুসুম' আছে 'পাঠ্য সখা' আছে 'পুরজনবাসী' আছে, 'কুলবালা কুলবধূ মত ঘোমটিয়ে' আছে 'শুভক্ষণে জন্মা" আছে! 'অশ্রুবারি' যে ঢের আছে; তাহা বলাই বাহুল্য। লেখক 'মাতরি ভাষায়' এই 'ভ্রাতৃবিলাপ' কাব্য 'গানিয়ে' (পাঠকগণ মাপ করিবেন, আমরা লেখকের ভাষায় বলিতেছি) এবং তাহা গৌড়জনকে 'শ্রবণাইয়া' পরম কৃতজ্ঞতা পাশে 'আবদ্ধিলেন'! তিনি যে 'জ্ঞানের উজল কাননে ক্ষণকালতরে প্রবেশিয়ে, চয়নিয়ে পুষ্প যত সুন্দর সুগন্ধ, গেঁথে চিকনিয়ে সে মালা গলে পরিধিছেন' তজ্জন্য তাঁহাকে সৌভাগ্যশালী না বলিয়া থাকা যায় না।"

নবনূরের সমালোচনা অনেকটা বিদ্বেষপ্রসূত বলেই মনে হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তার সূচনাঃ "ভ্রাতৃবিলাপ—কাব্য। এ, এম, এম, এইচ, আলী প্রণীত। গ্রন্থকারের নাম দেখিয়া 'রাধাকৃষ্ণ-সেবাদাস ধুরন্ধর বাবাজীর' কথা মনে পড়িয়া গেল। মুসলমান সমাজও ক্রমে সাহেবিয়ানার দিকে ছুটিলেন! উন্নতির লক্ষণ বটে! ভারতোদ্ধারের আর বিলম্ব নাই! দেশ হিতৈষীগণ আশ্বস্ত হউন!" এত করেও কিন্তু হামিদ আলীকে কাব্য রচনায় নিরস্ত করা যায় নি। সমালোচকের মর্মঘাতী আক্রমণ উপেক্ষা করে তিনি ১৩১১ সালের পৌষ মাসে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য "কাসেম-বধ কাব্য বা সাহাদতে ইমাম কাসেম (আঃ)" প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর, 'সুকীর্তি মুকুট বিভূষিত স্বনামখ্যাত মৌলবী আবদুল করিম, বি,এ,' সাহেবের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে কবি তাঁর কাব্য উৎসর্গ করেন। হামিদ আলীর জন্মস্থান চট্টগ্রাম। 'কাসেম বধ' প্রকাশ কালে তিনি নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কাজ করিতেন। কিন্তু

কাব্যের ভূমিকায় আছে—'কুষ্টিয়া ১৫ই পৌষ, ১৩১১ সাল।' মনে হয় ভূমিকা লেখা কালে কবি কুষ্টিয়ায় ছিলেন।

কবি 'যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়ার' সঙ্কল্প নিয়েই গ্রন্থ রচনা করেছেন সে ঘোষণা করেই তিনি কাব্যের আসরে নেমেছেন। জাতীয় আখ্যান কাব্য রচনার ধারাটি তখন, অন্তত মুসলমান সাহিত্যিকদের কাছে কাল ধর্মের বিরুদ্ধ সৃষ্টি বলে মনে হয়নি। বরং ঐ ধারাকে তাঁদের দানে সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় তাঁরা কিঞ্চিৎ ব্যস্তই ছিলেন। কাসেম বধ কাব্য উপরোক্ত মনোভাবেরই একটি ফসল। কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ "রাম রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত।" একটি বিরাট ও বিস্তৃত কাহিনীর কোন বিশেষ অংশ কবি কল্পনায় ধৃত হয়ে কাব্য-রূপ লাভ করে প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যে। অবশ্য মহররমের আংশিক ঘটনা অবলম্বনে পুথি সাহিত্য 'কাসেমের লড়াই' বা অমনি ধরণের কাব্য রচনার নিদর্শন আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যেও দেখতে পাই। তবে একটি কাহিনীর অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা বা চারিত্রিক অভিব্যক্তি শিল্পী চেতনায় যে অভিনব রূপ লাভ করে তার প্রথম পরিচয় রাবণকে আশ্রয় করে মাইকেলের সৃষ্টিতেই পাওয়া যায়। কাসেম বধ কাব্যেও শিল্পী চেতনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় কায়কোবাদকেই আমরা প্রথম মুসলমান কবি বলে ধরে আসছি। কিন্তু হামিদ আলী বা ফজলল করিমের কাব্য সাধনা অনুধাবন করে দেখা যায় যে তাঁরা কায়কোবাদের সমসাময়িক কালে ঐ ধারাকে পুষ্ট করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। এ ধারার একমাত্র সার্থক কাব্য মেঘনাদবধের প্রভাব হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ প্রভৃতি কবির কাব্যে দেখা যায় এবং কাসেম বধ কাব্যও তার থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি, ঘটনা বিন্যাস ও কাব্য সুষমার দিক থেকে এ কাব্য 'মহাশ্মশান' থেকে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে 'বৃত্রসংহারের' চেয়েও শ্রেষ্ঠ। 'কাসেম বধে' কবির দুর্লভ সংযম, প্রদীপ্ত বুদ্ধি এবং চমৎকার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্য পাঠ—কাব্যের প্রথমে 'প্রস্তাবনা' লিখে কবি কারবালা ঘটনার পূর্বে বিবি জয়নবের প্রতি এজিদের আকর্ষণ, বিষ প্রয়োগে এমাম হাসানকে হত্যা ও পথ ভুলে এমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে উপস্থিতির কথা সংক্ষেপে বলে নিয়েছেন।

দিবাবসানের বর্ণনা দিয়ে প্রথম সর্গ আরম্ভ। 'হেমাঙ্গি সঙ্গিনী' কল্পনা দেবীকে অনুরোধ করে কবি বলেছেন—

'বিতরণ কর মধু বঙ্গের পাঠকে
মধুর লেখনী হস্তে মধুময়ী ভাষে!'

ব্যর্থ প্রেমিক এজিদের আক্ষেপ ও মন্ত্রী মারোয়ানের সঙ্গে তাঁর মন্ত্রণা প্রথম সর্গের মূল কথা। রাজধানী দামেস্ক নগরে গভীর রাত্রে—'নীরব নিস্তব্ধ সবে নিদ্রার ক্রোড়েতে' অথচ সে নগরের যিনি অধিপতি তাঁর চোখে ঘুম নেই—

'কিন্তু এক দগ্ধ প্রাণ বিরহ অনলে
জ্বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি বায়ু বেগে,
ভস্মোন্মুখ গৃহ যথা মন্দ সমীরণে।'

জয়নবের স্মৃতি এজিদের প্রাণে দারুণ দাহ সৃষ্টি করেছে। তিনি মারোয়ানের কাছে আক্ষেপ করছেন—

'হায় কি কুক্ষণে
হেরেছিনু অপরূপ সে-রূপ মাধুরী
আভাময়, জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ চন্দ্র যথা।'

সংশয়ভরা মনে তিনি ভাবছেন হয়ত কারবালার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। মন্ত্রী মারোয়ান তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন—

'মনোরথ তব
পূর্ণ হইবার চিহ্ন যাইতেছে দেখা।'

কারণ 'কুফাধিপ জেয়াদ শঠের' অতি ভক্তিতে এমাম হোসেন যখন কুফা যাত্রা করেছেন এবং পথ ভুল করে কারবালায় পৌঁচেছেন তখন তার মধ্যে এজিদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। না হলে 'বিজ্ঞজন ভুলে কভু অতীব ভক্তিতে?' এত করেও এজিদ ভরসা পাচ্ছেন না। হোসেন পরিবারের বীরত্ব তার অজ্ঞাত নয়, বিশেষতঃ কাসেম ও অন্যান্য 'সিংহশিশু' তাঁর সঙ্গে আছেন ঃ কূটবুদ্ধি মারোয়ান বলেন 'নবীবংশ মহারথী' বটে তবে—

'যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্রমে
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে।'

তাঁর বিশ্বাস অচিরেই হোসেন 'সবংশে নির্ব্বংশ হবে কার্বালা প্রান্তরে জলাভাবে—' কারবালার সন্নিকটে ফোরাত নদী অবরোধ করে তিনি তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন

এতক্ষণে এজিদ মারোয়ানের প্রতি খুশী হয়ে উঠেছেন—'ধন্য হে খেলওয়াড় তুমি, ধন্য খেলা তব।' জয়নবের অভাব এজিদের জীবনকেই অর্থহীন করে ফেলেছে—

'রাজপুরী, রাজভোগ, রাজার সম্মান,
রাজসভা, রাজসজ্জা, রাজ্যের সৌন্দর্য্য
সকলি আমার কাছে সে রত্ন অভাবে
আভা শূন্য, শোভা শূন্য যথা বনস্থলী
কুসুম-রতন বিনে শীত ঋতু কালে।'

এ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি মারোয়ানকে কারবালায় দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাতে বলেছেন। মারোয়ান সে আদেশ শিরোধার্য করে—

'বাহিরিলা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে
কীটগ্রস্ত কুসুমেরে রাখিয়া কাননে।'

কারবালার 'মহামরু ভয়ঙ্কর' রূপ বর্ণনা করে দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ। মরুভূমির বাতাসে হায় হায় শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। কবি ভেবেছেন, নবীবংশের আসন্ন বিপদ স্মরণ করেই যেন সে বিলাপ করছে? মানুষের ভাগ্য লিপি তো খণ্ডাবার নয়—

'এ সংসার মায়াস্থল বড়ই ভীষণ
ভীষণ, ভীষণতর লীলা বিধাতার
বিজ্ঞ হইলেও নর না পারে মুছিতে
ললাট লিখন।'

কারবালায় এমাম হোসেনের ঘোড়ার পা বালিতে পুঁতে গেছে, তিনি মাটি রক্তবর্ণ দেখেছেন, সবই আসন্ন বিপদের লক্ষণ। তিনি সঙ্গীদের ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

সেই ভয়াবহ মরুভূমিতে পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমাম নিজের চেয়ে সঙ্গের শিশু, নারী ও জীবজন্তুর জন্য চিন্তিত হয়েছেন বেশী। তাঁর মনে হয়েছে এ মহা সঙ্কটের জন্য তিনিই দায়ী—'আমা হেন পাপী—পাপ করেছে পরশ'। পানির সন্ধানে যারা গিয়েছিল তারা এসে সংবাদ দিয়েছে যে এজিদের সৈন্য-বাহিনী ফোরাত নদী অবরোধ করে রেখেছে। একফোটা পানি তারা দেবেনা। ঠিক এ সময়েই কুফা থেকে দূত সংবাদ এনেছে যে মোসলেম শহীদ হয়েছেন ফলে—'উথলিল চারিদিকে বিপদ সাগর।' কিন্তু বিপদেরও যেন আর শেষ নেই। বিবি শাহেরবাণু 'দুগ্ধ পোষ্য শিশুলয়ে অঙ্কে আপনার' এমামকে জানালেন—

'কৃপণ আজি জননীর স্তন
স্বীয় সুতে দুগ্ধ দানে।'

এমাম হোসেন একাকী সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হতে চেয়েছেন এবং সকলকে মদিনায় ফিরে যেতে বলেছেন,; কিন্তু কেউ তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। অগত্যা তিনি সেদিনের মত সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিয়েছেন।

যুদ্ধ পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করে তৃতীয় সর্গ আরম্ভ —

'নীরব নিস্তব্ধ সবে কার্ব্বালা প্রান্তরে
মহাঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমনি।'

শত্রুর আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ওহাব নামে এমামের এক সহচর প্রথম যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তাঁর পত্নী সজল নয়নে তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে চুম্বন করলেন, এক ফোটা চোখের জল তাঁর কপোলে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

'হে মানব, স্বার্থ-দাস কেমনে বুঝিব,
একবিন্দু অশ্রু সতী-নারীর আপন
পতির উদ্দেশে কত মূল্যে মূল্যবান।'

রণক্ষেত্রে ওহাব 'একে একে সত্তর কাফেরে' নিধন করে ক্ষত-বিক্ষত দেহে শিবিরে ফিরে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। ওহাবের পত্নী—

'বিলাপিলা, নিনাদিলা সকরুণ স্বরে
পতির বিরহে, যথা বসে শূন্য নীড়ে
কপোত বিলাপে, যবে নির্দ্দয় কিরাত
বিনাশয়ে সহচরে।'

একে একে এমামের সঙ্গীগণ প্রায় সকলেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং এজিদের 'লক্ষাধিক সৈন্য' প্রাণ হারিয়েছে।

দ্বিপ্রহরে মরুভূমির ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করে চতুর্থ সর্গ আরম্ভ হয়েছে। উগ্র-প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখেই যেন—'বাজিছে তুমুল বাদ্য উভয় শিবিরে!' সঙ্গীরা শহীদ হয়েছেন, এমাম স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন এমন সময় কাসেম এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন এবং নিজে রণক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি মনে করেন, এজিদ বাহিনীতে এমন কোন যোদ্ধা নেই যার সঙ্গে এমাম যুদ্ধ করতে পারেন—'যুঝে কি শৃগাল সনে সিংহ নরত্রাস?' কিন্তু কি করে এমাম তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিপুল বাহিনীর সামনে পাঠাবেন—'কে ফেলে অমূল্য নিধি অতল সাগরে?' ওদিকে শত্রু যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে কাজেই কাসেম বলেন—

'বীরসুত, বীর আমি, বীর কুলোদ্ভব
বীর-ধর্ম্মে কি প্রকারে দিব জলাঞ্জলি ;'

শেষে এমাম কাসেমকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন 'লভ অগ্রে অনুমতি তব জননীর।' কাসেম-জননী সন্তানকে 'কাল সমরে' পাঠাতে চাননা কিন্তু তাঁর···

.....'বিদরে হৃদরে
প্রাণী সমূহের শুনে' ঘোর আর্ত্তনাদ
পানীয় জলের তরে—'

তিনি বীর জননী তাই 'কর্ত্তব্যের অনুরোধে' পুত্রকে আদেশ করেন—

'যাও সিংহসুত
দেখাও বীরের বীর্য, আক্রম শত্রুরে
শৃগালের পালে যথা সিংহ নরত্রাস।'

মায়ের অনুমতি পেয়ে কাসেম যুদ্ধে যাওয়ার উপক্রম করেছেন এমন সময় তাঁর চাচা এসে বললেন—

'তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
হয়েছে স্মরণ এক কথা গুরুতর।'

সে কথা হচ্ছে ঃ এমাম হাসান মৃত্যুকালে ভ্রাতৃকন্যা সখিনার সঙ্গে কাসেমের বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাসেমকে বিয়ে সমাধা করে যুদ্ধে যেতে বললেন। মাতাও কাশেমকে বললেন—'পিতা ও পিতৃব্যাদেশ করিতে পালন।' হতবাক কাসেম মার দিকে তাকালেন—

'কুরঙ্গ-কিশোর যথা কুরঙ্গিণী পানে
হেরে স্নেহ-আবাহন শুনয় যখন।'

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে নবযুবকের কাছে এ কি সম্ভাবনা! এ যে মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে পেছন থেকে মধুর জীবনের আহ্বান! কাসেমের অন্তরে শুরু হয়েছে আন্দোলন। জীবনের পেছন ফিরে তিনি দেখেছেন, সেই তাঁর আবাল্যের সঙ্গিনী—

'বহু যত্নে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে,
মোহণী-মূরতি যার হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপিয়া পুজেছে সদা নিভৃত-নীরবে
মাতা ও পিতৃব্য মতে সে আশা-লতায়
ফলিতে চলিল আজি মনোবাঞ্ছা ফল।'

তিনি যে সখিনার কাছে 'সঙ্গোপনে বিনামূল্যে অমূল্য হৃদয়' বিক্রি করে দিয়েছেন অনেক আগেই। তবে কি তিনি বীর ধর্ম বিস্মৃত হয়ে প্রণয় এবং ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পন করবেন? না, তা হতে পারেনা। কিন্তু 'গুরুজনাদেশ হায় লঙ্ঘি কি প্রকারে'—ঘোর সংশয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি পিতৃপ্রদত্ত কবচ খুলে দেখলেন, তাতে লেখা—

'অতীব সত্বর
করহ গ্রহণ পানি বিবি সখিনার।'

না, আর কোন দ্বিধা নেই। বিয়ে করা তাঁর প্রথম কর্তব্য। তিনি অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন। এবারে কবি পড়লেন সঙ্কটে। একে তো কারবালার রুদ্র ভয়ঙ্কর প্রকৃতি তার উপর—

'রমণী, পুরুষ, শিশু, যুবা বৃদ্ধ যথা
নিমজ্জিত শোক-নীরে, হ'তেছে উত্থিত
আর্ত্তনাদ হাহারব জল-বিন্দু তরে—'

কাজেই কবির ভাবনা—

'সেইস্থানে কি প্রকারে কহলো কল্পনে!
করিব আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?'

তবে তাঁর ভরসা, কল্পনা দেবীর কৃপালাভে যখন অনেকে স্বর্গের পারিজাত মর্তে ফুটাতে পেরেছেন, স্রোতস্বতী উজানে বহিয়েছেন, তখন তিনিও অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। হোলই না হয় ক্ষণিক আনন্দ তবু—

'বিবাহ উৎসব-বাদ্যে ভাসাই সকলে
কাল্পনিক সুখনীরে ক্ষণকাল তরে।'

কাসেম ও সখিনার বিয়ের খবর শিবিরে প্রচারিত হলে—

'সকলে এই নব সমাচার
শুনিলা স্বপনে যেন, ক্ষণেক নীরবে,
চাহিলা এ ওর পানে—সম্বোধি বলিলা
বিধাতার একি লীলা, একি অভিনয়?'

নিদারুণ দুঃসময়ে এ অভিনব সংবাদ নরনারীকে হতবাক করেছে। মুহূর্তের জন্য একে অন্যের মুখ চেয়ে কথা খুঁজেছে এবং তা না পেয়ে সকলে বিধাতার অপূর্ব লীলা স্মরণ করেছে।

অবশেষে 'শুনিলা সখিনা দেবী বার্ত্তা অভিনব'। এমন সংবাদ শোনার জন্য তিনি তো প্রস্তুত ছিলেন না, তাই 'নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল ক্ষণেক'; তার পর চোখে এল দু'ফোটা পানি, সে পানি গড়িয়ে পড়ল—

'সুন্দর কপোলে
মুক্তা বিনিন্দিত বিন্দু, শতদল দলে
শোভিল সুন্দর ভাবে;'

প্রথম আনন্দ-বেদনার ঘোর কেটে গেলে সখিনা দাম্পত্য জীবনের মহিমা বোঝার চেষ্টা করলেন। নিজের সুখ-সম্ভাবনা তাঁর মনে সকলের দুঃখ দূর হওয়ার কামনা জাগিয়েছে—

'রণজয়ী হয়ে
ফোরাতের জলে এবে করিবে শীতল
তৃষাতুর যোধ যত স্ব স্ব দগ্ধ প্রাণ।'

কিন্তু 'বামেতর আঁখি মোর কি হেতু নাচিছে?' অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠেছে এমন সময় 'রমণীবৃন্দ' এসেছে তাঁকে বধূ বেশে সাজাতে। সখিনা সেজেছেন—

'কঙ্কন মৃণাল ভুজে, হীরকের হার
উরসে, মুকুতাবলী, নিতম্বে মেখলা
চরণে নূপুর।'

নিরানন্দ পরিবেশে বিয়ে সমাধা হয়েছে। এমাম হোসেন নবদম্পতীকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

"ছিল আশা মম হৃদে" কহিলা নৃমণি
"সুসম্পন্ন করে এই বিবাহ উৎসব
মদিনায় সবান্ধবে যথা সমারোহে
এ-পোড়া হৃদয়-জ্বালা জুড়াব হেরিয়ে
তোমরা দুজনে সুখী।"

কাসেম ও সখিনার দাম্পত্য জীবনের মর্মভেদী পরিণতি পঞ্চম সর্গের মূল কথা 'বীরত্ব বিক্রমে' কাসেম অদ্বিতীয়। তাঁকে দেখে এজিদের সৈন্যরা ভয়ে পালায়—

'কুরঙ্গ পালায় যথা কেশরী দর্শনে'। এহেন বীর সখিনার সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে বিদায় প্রার্থনা করছেন। একবার কাসেম—

'চুম্বিলা সাদরে
অশ্রুমাখা চন্দ্রানন বিবি সখিনার
চুম্বে যথা মুগ্ধ অলি অরুণ-উদয়ে
শিশিরাক্ত গোলাপের কোমল কোরক।'

স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ সখিনা ভয়াবহ বাস্তবকে ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়েছেন, ডুবে গেছেন অতীতের সহস্র স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু তার অবকাশই বা কোথায়। এমাম পক্ষের কোন যোদ্ধাকে না দেখে বিপক্ষ শিবিরে 'বাজিছে সমর-বাদ্য দ্বিগুণ উৎসাহে।' বীর জায়া সখিনা শত্রুর স্পর্ধিত আহ্বান উপেক্ষা করে স্বামীকে প্রেম বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারেন না। তিনি কাসেমকে বিদায় দিলেন—

'অশ্বে সুসজ্জিত
আরোহিল এক লম্ফে বীর চূড়ামণি।'
অমনি 'সখিনার অন্তস্তল কাঁপিলা সবেগে।'

রণক্ষেত্রে এজিদ-বাহিনীর মহাবীর বর্জ্জখ কাসেমের হাতে নিহত হলে শত্রু সৈন্য পালাতে লেগেছে, ফলে 'ফোরাতের কূল প্রায় হলো প্রাণী শূন্য।' কিন্তু ঠিক এ সময়েই দামেস্ক থেকে এক নতুন বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কাসেমের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লেগেছে। সহসা একটি তীর তাঁর দেহে গভীর ভাবে বিদ্ধ হয়েছে। সে মুহূর্তে—

'সখিনার অন্তস্তল কাঁপিলা অজ্ঞাতে
পতিগতা সতী চক্ষে পড়িলা পলক।'

আহত কাসেম শিবিরে ফিরে সখিনার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত স্বামীকে দেখতে দেখতে সখিনাও—

'মুদিলা নয়নদ্বয় চিরতরে, যথা
প্রদোষ কমল হেরে অস্তগামী ভানু
মুদয় নয়ন ধীরে সন্তপ্ত-হৃদয়ে।'

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কবি আক্ষেপ করেছেন—

'রে দুরন্ত কাল! তোর প্রভাবেই আজ
গগণ রতন শশী ভূতলে লুণ্ঠিত।'

ষষ্ঠ সর্গের শুরুতেই প্রভাত বর্ণনা। আগের দিনে কাসেম ও সখিনার শোচনীয় পরিণাম দেখে—

'সারা রাত কেঁদে যেন ধীরে দুঃখ-ভরে
দেখা দিলা প্রভাকর রক্তাক্ত নয়নে।'

এমাম শিবিরে রুগ্ন জয়নাল ছাড়া আর কোন পুরুষ অবশিষ্ট নেই কাজেই যুদ্ধ যাত্রার জন্য স্বয়ং হোসেন প্রস্তুত হলেন। তিনি মহানবীর শিরস্ত্রাণ, হজরত আলীর কবচ, হজরত দাউদের কোমরবন্দ পরিধান করে 'দোল দোল' নামক অশ্বে আরোহণ করলেন। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে 'হনুফা নগরে' তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মহম্মদ হানিফা আছেন, তিনি কোন সূত্রে কারবালার ঘটনা জানতে পারলে এজিদকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে—

'উদ্ধারিবে নবীবংশে, বসাবে জয়নালে
মদিনার সিংহাসনে, ঘুচিবে সংকট।'

যুদ্ধক্ষেত্রে এমাম শত্রুদের নির্মূল করে 'নামিলা ফোরাত নদে তৃষ্ণা নিবারিতে।' কিন্তু আত্মীয় স্বজনের দুর্গতি মনে পড়ায় তিনি পানি পান না করে ওজু করে তীরে উঠে এলেন। নামাজান্তে শিরস্ত্রাণ, কবচ প্রভৃতি খুলে ফেললেন। এ অবস্থায় শত্রুরা দূর থেকে তাঁকে তীর বিদ্ধ করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং 'সমুর' নামে এক সৈনিক—'বিচ্ছিন্ন করিলা শির—দেহতরু হতে।'

আরোহীশূন্য 'দোল দোল' শিবিরে ফিরে এলে সকলে পরিণাম বুঝে হাহাকার করে উঠলেন। বিবি জয়নব তার রূপের জন্য আক্ষেপ করেছেন—'এ রূপের মোহে মজি দুর্ম্মতি এজিদ ঘটাইল অঘটন।'

এর পর কবি 'কল্পনাদেবী'র সাহায্যে 'মানস চক্ষুতে' শহিদগণের স্বর্গারোহণ অবলোকন করে কাব্য শেষ করেছেন—

'শহিদানের অগ্রগামী মহাত্মা হোসেন (আঃ)
হেরিয়া জুড়াও চক্ষু ; তাহার পিছনে
নব দম্পতীরে দেখ—কি ফুল্ল বদন।
চলন ভঙ্গিমা কিবা মৃদুল গমন।
পরিশেষে ঐ দেখ আকবর আসগর
কাসেম-সখিনা সনে চলেছে আহ্লাদে
দেখিছ কি অগণন শহিদ আত্মায়
প্রবেশিছে সুরপুরে জয় জয় রবে।

'কাসেম বধ' কাব্যে প্রধানতঃ দু'টি গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। কাহিনী রচনার দিক দিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর এবং ছন্দ, উপমা, ঘটনা-বিন্যাস প্রভৃতির দিক দিয়ে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের। এক জায়গায় কবি মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহার কাব্যের ঘটনাকে উপমা হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। কাসেমকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিদায় দিয়ে সখিনা—

'অতঃপর শূন্য হৃদে পশিয়ে শিবিরে
মুছিলা আঁখির জল—কাতরা বিরহে
কাদিলা নীরবে যথা প্রমীলা সুন্দরী
বিদায়িয়ে ইন্দ্রজিতে সৌমিত্রি বিনাশে
(কিম্বা যথা ইন্দুবালা বীর রুদ্রপীড়ে
হারাইয়া কেঁদেছিলা বিবশা স্বগৃহে,
কেঁদেছিলা শূন্য মনে প্রাণ পতি তরে)।'

মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় মানুষের জীবনে নিয়তির অনিবার্য বিধানকে কবি বার বার স্মরণ করেছেন এবং কাব্য শেষে নিহত বীরগণকে স্বর্গে যেতে দেখেছেন।

কারবালা ট্রাজেডির যে কাহিনী শিল্পীর কল্পনায় পল্লবিত হয়ে বাঙলা ভাষায় বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তারই একটি খণ্ড ঘটনা কাসেম বধ কাব্যের অবলম্বন। এ কাব্য ইতিহাসকে অনুসরণ করেনি বরং ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেগকে আশ্রয় করেই স্ফূর্তি লাভ করেছে। এ সম্পর্কে ভূমিকায় কবি বলেছেন—'ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারিনা,—কাব্যের পথ নিষ্কণ্টক।' বস্তুতঃ কাব্যের নিষ্কণ্টক পথে আবেগ ও অনুভূতির বাধাহীন প্রকাশের মধ্যে কাসেম বধ কাব্যের প্রধান গৌরব প্রকাশ পেয়েছে।

নারীরূপের যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ পুরুষ চিত্তে নিদারুণ প্রদাহ সৃষ্টি করে তারই পরিচয় দিয়ে এ কাব্যের সূচনা। জয়নবের রূপশিখা এজিদের অন্তরে যে লালসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল তা ব্যর্থতার ঘৃতাহুতিতে দাবদাহ সৃষ্টি করেছে এবং কারবালা প্রান্তরে এমাম পরিবারকে ধ্বংস করেছে। আবার এই ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যে পুরুষের এই পৈশাচিক ক্ষুধা এবং লালাসার প্রলয় নৃত্যের মধ্যে জীবনের এক করুণ অথচ মধুর রূপকে কবি কাসেম ও সখিনার দাম্পত্য প্রণয়ে অবলোকন করেছেন। একদিকে জীবনের প্রদাহ অন্যদিকে তারই প্রশান্তি। একদিকে কাম অন্যদিকে প্রেম। নর-নারীর যে প্রেম মাধুর্য ও কল্যাণের মধ্যে বিকশিত তাকেই কবি কারবালা প্রান্তরে সর্বনাশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাসেম বধ কাব্যে যুগ-সমস্যার কোন প্রতিফলন নেই। যুগ চেতনার কোন বিক্ষোভ বা সেই বিক্ষোভ-সঞ্জাত শিল্পী চিত্তের ভাবনা এ কাব্যের মূল প্রেরণা নয়। কাব্যে নাটকীয় সংঘাত ও বিস্ময়ের অভাব না থাকলেও এতে কবির দৃষ্টিভঙ্গী Objective নয়। একটা প্রেম-আখ্যানসুলভ emotion সমগ্র কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কারবালার কাহিনীর রোমান্সকেই কবি কাব্যের প্রধান উপজীব্য করেছেন। বীর রসের যে টুকু প্রকাশ ঘটেছে তা ঐ রোমন্টিক পরিবেশ রচনার জন্যই। কাসেমের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ সর্গ অত্যন্ত দুর্বল ও প্রাণহীন হয়েছে। একটা পরিণতির মধ্যে কাব্য সমাপ্ত করার জন্য কবি কোন মতে তার জের টেনে গেছেন।

কাব্যের স্থানে স্থানে ছন্দের ত্রুটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। কাহিনী রচনা ও উপমা প্রয়োগে কবি অন্যান্য গ্রন্থের অনুকরণ করেছেন। তথাপি এতে কবি-কল্পনার সমৃদ্ধি এবং রূপ সৃষ্টির মৌলিকত্ব পাঠককে চমৎকৃত করে। বিশেষ করে চরিত্র অঙ্কনে এবং ঘটনা সংস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম সর্গে এজিদ ও মারোয়ানের চিত্রে একদিকে জয়নব লাভে ব্যর্থ এজিদের চিন্তাক্লিষ্ট মূর্তি, অন্যদিকে মারোয়ানের শঠতা ও কুটিলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জয়নবকে করায়ত্ত করার জন্য এজিদ বহু ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছেন, কাজেই কারবালায় তাঁর সৈন্যবাহিনী যে সফল হবে এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় নন। মারোয়ানের কিন্তু স্বীয় কুটবুদ্ধির উপর অবিচল আস্থা। তিনি জানেন—

যে কাজ অসাধ্য সদা বীরত্ব বিক্রমে
তাহাও সম্পন্ন হয় কৌশল কল্যাণে।

এমাম হোসেনের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন কারবালা প্রান্তরে ভয়াবহ সঙ্কটে তিনি বিচলিত হননি। খোদার অনন্ত ইচ্ছা-সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন—

'এ তুচ্ছ জীবন
বিসর্জিব অকাতরে ; যেমতি পতঙ্গ
নির্ব্বানে জীবন দীপ দীপ-প্রীতিভরে।'

একাকী বিপদের সম্মুখীন হতে চেয়ে তিনি সঙ্গীদের ফিরে যেতে বলেছেন কিন্তু তাঁরা সম্মত হননি। অবশেষে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর আস্ফালনের জবাবে তিনি শুধু বলেছেন—'তোর

অভ্যর্থনা তরে নরক সজ্জিত' এবং পরক্ষণেই তাকে নরকে প্রেরণ করেছেন। বীরত্ব প্রকাশের নামে বৃত্রসংহার, মহাশ্মশান প্রভৃতি কাব্যে যে বক্তৃতার বাহুল্য ও আস্ফালনের উগ্রতা দেখা যায় তা এ কাব্যে নেই। কারবালা প্রান্তরে এমাম হোসেন ছিলেন বিশ্বাসী দলের নেতা। কবি তাঁর চরিত্রে নেতাসুলভ উদারতা, গাম্ভীর্য ও মহিমা প্রস্ফুটিত করেছেন। এমামের সংযত, বীর এবং গম্ভীর মূর্তি কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে বিবাহের আয়োজন কাসেমের মনে যে দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব সখিনার প্রাণে যে আশ-নিরাশার আন্দোলন এবং শিবিরের নর-নারীর মধ্যে যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কবি তাকে সংযত বর্ণনায় আশ্চর্য নৈপুন্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। কারবালার ভয়াবহ পরিবেশে কাসেম ও সখিনার মধ্যে শাশ্বত নরনারীর যে মধুর আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে তা পাঠককে অভিভূত করে। মরণালিঙ্গনের পূর্ব মুহূর্তে নবদম্পতির প্রেমালিঙ্গন যেন মানুষের ক্ষণিক জীবনের ক্ষণিকতর আনন্দকে প্রবলভাবে আস্বাদনের চিরন্তন ব্যাকুলতা। একটীর পর একটী সংক্ষিপ্ত ও গতিশীল দৃশ্য অঙ্কন করে, সর্বোপরি পরিবেশকে যথার্থভাবে চিত্রিত ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কবি কাসেম ও সখিনার মর্মান্তিক পরিণতিকে কাব্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন এবং এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

কাসেমবধ কাব্য সমসাময়িক কালের মুসলমান সাহিত্য-সমাজে অনেকখানি সমাদর লাভ করেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোলতান পত্রিকায় কাব্যটি সম্পর্কে বলা হয়—"তাঁহার কাব্যখানা বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একখানি শ্রেষ্ঠতম কাব্য নামে বাচ্য হইবার যোগ্য। তাঁহার যেরূপ কল্পনা ও রচনা-শক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাদ্বারা আশা করা যায়, কবি কালক্রমে একজন সাহিত্য সমাজের বিশেষ সম্মানিত মেম্বর মধ্যে গণ্য হইবেন।" ১৩১২ সালের ২০শে মাঘ মিহির ও সুধাকরে মহাম্মদ মিন্নত আলী কাসেমবধ কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—প্রাচীন কার্ব্বালার সেই বীরত্বের করুণ-রসপূর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান কবি আজ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি বাঙ্গলা ভাষায় অলঙ্কার স্বরূপ হইল, এ কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।" কাব্যের ভাষা বিচার করে ১৩১২ সালের ৯ই ভাদ্র এডুকেশন গেজেটে মন্তব্য করা হয়—"ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিয়া পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীয় মুসলমান কবি প্রকৃতই বাঙ্গলার সুসন্তান।" কাব্য প্রকাশের পাঁচবছর পরেও সমালোচকের কাছে মনে হয়েছে—"বঙ্গভাষা-সুন্দরী কণ্ঠে গ্রন্থকার একখানা অমূল্য অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া

তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন ; মোসলমান কবির কোন কাব্যই ইহার সমকক্ষতায় সক্ষম নহে ; বরং আলোচ্য কাব্যের কবি উচ্চদরের হিন্দু কবিদের সহিত সাহিত্য-মন্দিরে আসন পাইবার যোগ্য।" (মোশ্লেম-সুহৃদ, দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৫ সন)।

কবির নির্মম সমালোচক নবনূর পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) কাসেমবধ কাব্যে কবির 'গুণপনার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইলনা' বলে মনে করেছে এবং কবি উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তাঁহার এই কাব্যের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়' বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে হামিদ আলীর 'জয়নলোদ্ধার কাব্য' প্রকাশিত হয়। ভূমিকার কবি বলেছেন—"কাসেম-বধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহই এই কাব্যের আলোচ্য বিষয়।" 'কাসেম-বধ' ও 'জয়নলোদ্ধার' এ দু'খানা কাব্যই ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্মায় ছাপান। প্রথমটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০শ' দ্বিতীয়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬, সর্গ সংখ্যা পাঁচ। প্রথম কাব্যের পরিপূরক হিসেবেই কবি দ্বিতীয় কাব্য রচনা করেন। প্রথমটিতে কারবালায় নবীবংশের দুর্ভোগ, দ্বিতীয়টিতে এজিদের পতন ও নবীবংশের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে।

কাব্য পাঠ—'অধম সন্তান—এ, এম, এম, হামিদ আলী' একটি কবিতা লিখে তাঁর 'পরম পূজনীয়া জননী দেবীর শ্রীচরণ কমলে' জয়নলোদ্ধার কাব্য উৎসর্গ করেছেন।

'অবসান প্রায় নিশি'র প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা করে প্রথম সর্গ আরম্ভ। প্রভাত রাজসভায় বসে এজিদ ব্যাকুল হয়েছেন—

'লভিবনা কিহে আমি রমণীর মণি
অতুল্যা জয়নবে,'

এমন সময় মারোঁয়ান কারবালা যুদ্ধে জয়ী সৈন্যবাহিনীর সংবাদ দিয়েছে—

'আসিয়াছে সন্নিকটে এ রাজধানীর ;
বন্দী ক'রে আনিয়াছে নবি-পরিজনে।'

উৎফুল্ল এজিদ সকলকে অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে আনতে বলেছেন, বিবি জয়নব সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন—

'রাজরাণী, রাজবেশে, রাণীর আদরে
আনহ প্রাসাদে ত্বরা হৃদয় রাণীরে।

এজিদের 'অন্তঃপুর রূপসীরা' জয়নবকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন—'দুর্লভ মরতে হেন মাধুর্য্য।' কিন্তু—

'শোকে দুঃখে ম্রিয়মানা
রবিকর দগ্ধ ছিন্ন চারুলতা যথা।'

রাজপুরীতে বন্দিনী জয়নব রাত্রিকালে স্বপ্নে 'স্বর্গীয় কোমল সুমধুর বাদ্য' শুনেছেন এবং 'মাতৃমূর্ত্তি সম এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী' তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন—

'মহাম্মদ হানিফা নামে পরাক্রান্ত বীর
আছে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তোমার পতির।'

তিনি এজিদকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে নবীবংশ উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন—

'মহাহবে পরাজিয়ে তারে বীরমণি
দণ্ড দিবে সমুচিত লণ্ডভণ্ড করি
দমস্ক সাম্রাজ্য;'

দ্বিতীয় সর্গে এজিদ জয়নবকে বশীভূত করার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেছেন এবং প্রভাতে—

'প্রেরিলা সুদক্ষা এক প্রধানা বামারে
বলিবারে স্ববক্তব্য জয়নব-সমীপে।'

চতুরা দূতী জয়নবের কাছে গিয়ে প্রথমে তাঁর রূপগুণের অশেষ প্রশংসা করেছে। তাঁকে 'পূর্ব্ব স্মৃতি' সমস্ত 'অতল বিস্মৃতি গর্ভে' বিসর্জন দিতে পরামর্শ দিয়েছে। তার পর এজিদকে পতিত্বে বরণ করার উপদেশ দিয়ে বলেছে—

'অভ্রভেদী তরুরাজ স্নেহ-প্রীতি ভরে
দাঁড়ায়েছে, দেখ, দিতে তোমারে আশ্রয়।
তাপক্লিষ্ট দেহ স্বীয় জুড়াও সত্বর
সেই তরুবর ছায়া করিয়া আশ্রয়।

বুদ্ধিমতী জয়নব দূতীর প্রস্তাবের সরাসরি জবাব না দিয়ে বন্দী এমাম পরিবারের মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এজিদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে দূতী জানিয়েছে—

'বন্দিবৃন্দ সুখ-শান্তি, মুক্তি নিরাপদে
অভিপ্রায়, অভিলাষ সেই রূপসীর।'

সে এজিদকে বুঝিয়েছে—

'যাদুকর বিষাকর ভুজগে করিতে
অনুগত, জেন' অগ্রে আয়াস স্বীকার
করয় অশেষ, পরিশেষে তারে ল'য়ে
খেলে ইচ্ছামত নানাবিধ লীলা-খেলা।'

কাজেই এজিদও যেন জয়নব লাভে ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রসর হন। দূতীর পরামর্শে এজিদ বন্দীদের 'সুখে সম্ভ্রমে' রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন এবং তাকে পুরস্কার দানের আশ্বাস দিয়েছেন। সে 'হরিষ অন্তরে' বিদায় নিয়েছে—

'বিরহ তাপিত পিকে রাখিয়ে কাননে
কুহরিতে 'কুহু কুহু' হৃদয় জ্বলনে।'

তৃতীয় সর্গে এজিদ চিন্তা করছেন—

'রাখিবে জীবিত, কিংবা বধিবে পরাণে
সিংহসুত রিপুত্রাস জয়নালাবেদীনে।'

নিজে স্থির করতে না পেরে তিনি 'সচিব বৃন্দের' পরামর্শ চেয়েছেন। তাঁরা কেউ জয়নালকে—'প্রাণাদান নিরাপদ নহে সুনিশ্চয়' বলেছেন, কেউ তাকে 'নিষ্পাপ নিরীহ শিশু' বলে ক্ষমা করতে বলেছেন। কিন্তু মারওয়ান দিয়েছেন অভিনব পরামর্শ। তিনি জয়নালকে হত্যা না করে বরং তাকে দিয়ে এজিদের স্তুতি পাঠে বাধ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন। এজিদ সে কাজের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত করেছেন—

'যাও তুমি 'জুমা' গেহে ; জয়নালেরে দিয়ে,
মম নামে 'খোতবা' পাঠ করাও সত্বর।'

কিন্তু খোতবা পাঠ করতে গিয়ে সমবেত উপাসনাকারীদের সামনে জয়নাল আবেদীন এজিদের দুষ্কৃতির চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন এবং নবীবংশের গৌরব ঘোষণা করেছেন।

চতুর্থ সর্গে কবি 'প্রিয় সহচরী' কল্পনাদেবীর সঙ্গে 'মহাম্মদ হানিফা'র রাজ সভায় উপস্থিত হয়েছেন। দূতের মুখে এমাম পরিবারের শোকাবহ পরিণাম শুনে হানিফার—'ভ্রাতৃশোকে, পুত্রশোকে সিক্ত বক্ষঃস্থল।' অচিরেই তাঁর শোক ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন—

'চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিশ্ববাসী সব
দেখিবে হানিফ-ক্রোধ, দর্প বীরত্বের !'

রাবণের মত তাঁরও প্রতিজ্ঞা

'অ-এজিদ কিম্বা অ-হানিফ ভূমণ্ডল
হবে আশু ;'

অবিলম্বে তিনি দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁর সঙ্গে চলেছে অগণিত বীর যোদ্ধা, তাদের 'মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর', তারা—

'গরজে যথা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুল
পাইয়ে মৃগের সাড়া দূর বন-মাঝে।'

পঞ্চম এবং শেষ সর্গে হানিফা 'সুকৌশলে গভীর নিশীথে' দামেস্ক নগরে প্রবেশ করেছেন। এজিদ বাহিনী 'রক্ষিতে জনমভূমে—স্বাধীনতা ধনে' প্রাণপণ সংগ্রাম করে ব্যর্থ হয়েছে। রণক্ষেত্রে হানিফা এজিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বহুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর হানিফার অস্ত্রাঘাতে—'ভূতলে পতিত হয়ে মাবিয়া দুলাল' পিপাসায় কাতর হয়েছেন। শত্রুর শোচনীয় অবস্থা দেখে দয়ালু হানিফা—'লইলা কোমল অঙ্কে এজিদের শির।' কারবালা প্রান্তরে পিপাসার্ত্ত হোসেন পরিবারের নিদারুণ কষ্ট অনুভব করতে করতে অনুতপ্ত এজিদ হানিফার কোলে মাথা রেখে পরলোক গমন করলেন এবং

'বিজয়-দুন্দুভি
বাজিয়া উঠিল ত্বরা কাঁপায়ে দমস্ক
"জয় জয়" রবে বিশ পুরিল মুহূর্ত্তে'

কাসেমবধ কাব্যের তুলনায় জয়নলোদ্ধার কাব্যটি দুর্বল। এটির কাহিনী সুসংগঠিত নয় এবং এতে বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি-প্রাণের গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়নি। পুথি সাহিত্য ও বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে কারবালা কাহিনীর যে পরিণতি দেশে প্রচারিত হয়েছিল তাকে অনুসরণ করেই কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কাহিনী রচনার দিক থেকে তাঁর অভিনবত্ব হচ্ছে হানিফা ও এজিদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এজিদের মৃত্যু এবং অনুতপ্ত এজিদকে অন্তিম কালে হানিফার কোলে স্থান দান। তবে এ কাব্যে পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং 'জনমভূমি'র গৌরব রক্ষার্থে আহ্বান জানানো হয়েছে।

জয়নালোদ্ধার কাব্যে মাইকেলের অনুকরণ অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। 'পলাশির যুদ্ধের' মত এখানেও 'কাঁপাইয়ে জলস্থল, কাঁপায়ে মেদিনী' 'রণবাদ্য পূর্ণোৎসাহে' বেজে উঠেছে, তবে তা যুদ্ধের ভয়াবহতার চেয়ে কাব্য রচনায় কবির দৈন্যকেই বড় করে তুলেছে।

হামিদ আলীর সোহরাব বধ কাব্যটি দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি। এ পর্যন্ত তাঁর কাব্য রচনার যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় 'কাসেম বধ কাব্য'টিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।